লঘুপাক

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

॥ মিত্রালয় ॥
১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ : ১৩৬৫

তিন টাকা

এই লেখকের

*

রাণুর প্রথম ভাগ
রাণুর দ্বিতীয় ভাগ
রাণুব তৃতীয় ভাগ
রাণুর কথামালা

নয়ান বৌ
কাঞ্চন মূল্য
শারদীয়া
হৈমন্তী
বরযাত্রী
স্বর্গাদপি গরীয়সী
নীলাঙ্গুরীয়
বাসর
দৈনন্দিন
কথাচিত্র
নব সন্ন্যাস
অতঃকিম্

ইত্যাদি

*

মিত্রালয়, ১২ বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ হইতে জি. ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত এবং
মানসী প্রেস. ৭৩, মাণিকতলা স্ট্রীট হইতে শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

বন্ধুবর শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সেন,

সুরসিকেষু

ব. ভ. ম.

চিকিৎসা

বৃদ্ধ নবীন কুণ্ডু হঠাৎ সাংঘাতিক রকম পীড়িত হইয়া পড়িয়াছে, প্রবল উত্তাপ, বিভ্রান্ত বকা, মাঝে মাঝে অচৈতন্য, ইত্যাদি ইত্যাদি।

কুণ্ডু মশাইয়ের কোষ্ঠীতে 'হঠাৎ'-শব্দটির প্রভাব কিছু বেশি। একজন আড়ৎদারেব দোকানে খেরো খাতায় হিসাব লিখিত, হঠাৎ ছাড়িয়া দিয়া একদিন অল্প-অল্প চাল-ডাল-তেল-নুন সাজাইয়া নিজেই ছটাক খানেকের একটা দোকান খুলিয়া বসিল। এই রকমই চলিল বহুদিন, দাড়ি চুল পাকিয়া আসিল, তাহার পর একদিন হঠাৎ কুণ্ডু মশাইকে চেনা দায় হইয়া উঠিল—আঙ্গুল ফুলিয়া রাতারাতি কলাগাছ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকাণ্ড আড়ৎ, প্রকাণ্ড বাড়ি, প্রকাণ্ড আরও অনেক কিছু।…সমস্ত লড়াই-দুর্ভিক্ষেব যুগটা ফুলিবার পালা এমন ভাবে চলিল যে আঙ্গুল তো দূরের কথা, এখন আর সেই কলাগাছ বলিয়া চেনাও দুষ্কর।

এমন সময় হঠাৎ এক সাধুর আবির্ভাব, বেশি নয়, মাত্র দু'দিন আগের কথা। কি মন্ত্র ফুঁকিয়া গেল কানে, নবীন কুণ্ডু সব ছাড়িয়া-ছুড়িয়া ওপরের একটা ঘরে হাত-পা কোলে করিয়া যোগাসনে বসিয়া গেল। কাল সমস্ত দিন এই ভাবে গেছে, একটু কাঁচা-দুধ আর গোটাকতক ফল-মূলের কুচির ওপর। ভোগের শরীর, এতেই বেশ খানিকটা কাৎ করিয়া দিয়াছিল, তাহার ওপর আজ আরও অত্যাচার গেছে—সকাল বেলা ক্রোশ খানেক পথ ঠেলিয়া কালীঘাটে গেল, ফিরিয়া অভুক্ত অবস্থাতেই ওপরে উঠিয়া গেল, মুখে দারুণ উদ্বেগের ভাব, যেন আর সময় নাই, খুব তাড়াতাড়ি কি কতকগুলা ব্যাপার সারিয়া

লইতে হইবে। কথা খুব অল্প হইয়া গেছে, মৌনাবলম্বনের প্রায় কাছাকাছি অবস্থা, শুধু বলিয়া গেল কালকের মতো মাত্র একটু কাঁচা-দুধ আর কয়েক খণ্ড ফলমূল দিয়াই ক্ষুন্নিবৃত্তি করিবে, তাও বেলা পড়িয়া গেলে। দুয়ার বন্ধ করিয়া আবার আসনে বসিল। বারণ রহিল কেহ ওদিকে গিয়া যেন বিঘ্ন উৎপাদন না করে।

সকলে উৎকণ্ঠিতই ছিল, বিকাল হইলেই আহার্য লইয়া গৃহিণী আর পুত্রবধূ গিয়া দুয়ারে মৃদুমন্দ করাঘাত করিল। দুয়ার তো খুলিলই না, অধিকন্তু বিড় বিড় করিয়া অস্পষ্ট উচ্চারণে যে কতকগুলি কথা আসিয়া কানে লাগিল তাহাতে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া উভয়ে উভয়ের মুখের পানে স শয়ের দৃষ্টিতে একটু তাকাইয়া রহিল। পুত্রবধূ একটু জোরে দুয়ারে করাঘাত করিয়া ডাকিল—'বাবা!'

উত্তর নাই, বিড়বিড়ানি একভাবে শোনা যায়, মাঝে মাঝে কতকগুলা কথা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—হাজার বোরা—মড়ক—বিশ লাখ—সরিয়ে ফেল! সরিয়ে ফেল্!...

গৃহিণী, বধূ দুই জনেই দুয়ারে প্রবল করাঘাত করিয়া ডাকাডাকি করিল। একটুখানির মধ্যে বাড়িতে হৈচৈ পড়িয়া গেল। কপাট ভাঙ্গিতে হইল, তাহার পর দেখা গেল নবীন কুণ্ডু গুটিসুটি মারিয়া পড়িয়া আছে, খানিকটা আসনে খানিকটা মেঝেয়, আব জ্বরের তাপে শরীর পুড়িয়া যাইতেছে। পাঁজায় তুলিয়া তাড়াতাড়ি শয়নঘরে লইয়া যাওয়া হইল।

ছুটাছুটি হাঁকাহাঁকি পড়িয়া গেল, ডাক্তারের জন্য মোটর ছুটিল, ভাইপো কাঙালিচরণ দিনাজপুরের দিকে চাল খরিদ করিতে গিয়াছে, গবর্ণমেণ্টের ঠিকা, তাহাকে জরুরী তার করিয়া দেওয়া হইল। ছেলে হারাধনের জন্যও চারিদিকে লোক দৌড় করাইয়া দেওয়া হইল।

কঠিন ব্যাধি, ডাক্তারেরা একেবারেই থৈ পাইতেছে না। ব্যাধির

ইতিহাসের মধ্যে পাওয়া যাইতেছে সাধুর দ্বারা কিছু হোম-যাগের অনুষ্ঠান, আর কাল থেকে আজ পর্যন্ত নবীন কুণ্ডুর একরকম উপবাস করিয়াই কি সব যৌগিক সাধনায় ব্যাপৃত থাকা। প্রথমটা মনে হইয়াছিল সাধু কিছু খাওয়াইয়া গিয়া থাকিবে। পাকস্থলীতে পিচকারি লাগাইয়া কিছু পাওয়া গেল না, রক্ত পরীক্ষা করিয়াও নয়। অন্য পরীক্ষাও হইল নানা রকমের, ডাক্তারের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং প্রত্যেকে একটা নূতন কিছু পরীক্ষা করাইল, কিম্বা আগের পরীক্ষা নূতন স্থান হইতে করাইয়া আনিল, কিন্তু কিছুই হদিস পাওয়া যাইতেছে না।

অবস্থা এদিকে ক্রমে খারাপই হইয়া উঠিতেছে, স্বরটা ঠেলিয়া উঠিতেছে, অচৈতন্য অবস্থার মেয়াদটা বাড়িতেছে, যখন চেতনা হইতেছে তখন ভুল-বকাও সমানে চলিয়াছে। একটা জিনিস স্পষ্ট, ব্যাধিটা ক্রমেই যেন মস্তিষ্কের দিকে অগ্রসর হইতেছে, সেখানে একবার জাঁকিয়া বসিলে আর উপায় থাকিবে না, এদিকে বয়স হইয়াছে যে অনেক।

২

পরদিন কাঙালিচরণ আসিয়া উপস্থিত হইল। ছেলেটা জ্যেঠার ভারি ভক্ত, আগে ছিল না, লড়াই-দুর্ভিক্ষের পর থেকে হইয়া উঠিয়াছে। তাহা ভিন্ন নূতন ব্যবসায়ে ঢুকিয়া চোরাকারবারে টাকার স্বাদ পাইয়াছে, কিন্তু জ্যেঠার নিকট হইতে এখনও উপার্জনের সমস্ত রহস্যগুলা অধিগত হয় নাই। বাঁচাইয়া তুলিবার জন্য প্রবল বেগে আবার নূতন করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ করিয়া দিল। কিছুই ফল হইল না, তবে অনেকগুলা টাকা পকেটস্থ করিয়া ডাক্তারেরা একটা নূতন চিকিৎসার সন্ধান দিয়া গেল। বলিল ব্যাধিটা নিছক মানসিক, মনঃসমীক্ষক ডাকিতে হইবে, ইংরাজি নাম বলিল 'শাইকিএ্যাট্রিষ্ট'।

দু'একজনের ঠিকানাও দিয়া গেল। কাঙালিচরণ খুব বড় দেখিয়াই একজনকে ডাকিয়া আনিল। সে প্রলাপের দিকে কান পাতিয়া ঘরে রোগীর কাছে প্রায় ঘণ্টাখানেক একলা বসিয়া থাকিবার পরে বাহিরে আসিয়া প্রধানতঃ রোগীর নৈতিক চরিত্র লইয়া কাঙালিচরণকে যে সব প্রশ্ন করিতে লাগিল, তাহাতে কাঙালিচরণের মনে হইল সে নিজেই প্রলাপ বকিতেছে। যাই হোক চিকিৎসায় ঢিলা দিল না, আরও জন দুই তিন ঐ-জাতীয় ডাক্তার ডাকিয়া কন্‌সাল্‌টেশনের ব্যবস্থা করাইল, তাহারা প্রলাপ শুনিবার জন্য একজোটে ঘণ্টাখানেক বসিয়া থাকিবার পর বাহিরে আসিয়া আধঘণ্টা প্রলাপগুলা বিশ্লেষণ করিয়া রায় দিল—বিশেষ কিছু পাওয়া যাইতেছে না, তবে ব্যবসায় সংক্রান্ত ব্যাপার থাকা নিতান্ত অসম্ভব নয়; তাহার সঙ্গে বোধ হয় লিবিডোর গোলমালও আছে। অন্য ডাক্তার ডাকিয়া রোগীকে সামান্য একটু চাঙ্গা করিতেই হইবে যাহাতে সে প্রলাপের বাহিরে একটু আলাপ করিতে পারে,—দু' একটা সাদা প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে।

আবার দৈহিক ডাক্তার আসিল, রক্ত প্রভৃতি আর একবার পরীক্ষা করাইয়া নূতন করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ হইবে,—এমন সময় কোথা থেকে হঠাৎ হারাধন আসিয়া উপস্থিত হইল।

হারাধন নবীন কুণ্ডুর পুত্র। ঐ একটি মাত্র ছেলে, কিন্তু একেবারে বাতিল। বাড়ির সঙ্গে কোন সম্পর্ক নাই। নেশা-ভাঙ্‌ লইয়া বাহিরে-বাহিরেই কাটায়—অভাব-অনটনটা হইল, মাসে এক-আধবার বাড়ি আসিল, যে-কোন উপায়ে কিছু মোটারকম হাতাইয়া আবার উধাও হইল। এর মধ্যে ছেলে যে একটা আছে নবীন কুণ্ডু সেটা টের পায় এ-দোকান, ও-হোটেল, সে-রেস্তরাঁর বিলে। নির্বিবাদে শোধ করিয়া দেন। একটি ছেলে, স্নেহের দুর্বলতা আছেই, তাহা ভিন্ন মাতাল ছেলে বাড়ি আসিয়া গণ্ডগোল লাগাইবে সে ভয়টাও আছে ষোল আনা,

টাকা যে ভাবেই আসুক, বাড়িতে গাড়ি, লোক-লস্করে মর্যাদাটা তো বাড়িয়াছেই।

হারাধন যে শুধু স্নেহের ওপর নির্ভর করিয়া আছে এমন নয়, নিজের দর বোঝে, একটু স্পষ্টবক্তা তায় প্রায় সারাক্ষণই রঙে থাকে। অল্প একটু বাধা পাইলেই বলে—"দেবেনা বললেই হোল? যে কাণ্ডটি ক'রে হাজার হাজার লোককে পেটে মেরে বাবা স্বর্গে যাচ্ছে, সেখানে খোরাক জোগাতে হারাধনকে কী বেগটা পেতে হবে ভেবে দেখবে না?—"

হারাধন বাপের অসুখের সংবাদ শুনিয়া আসে নাই, এমনি মাঝে মাঝে নিজের মর্জি মাফিক যেমন আসে সেইভাবে হঠাৎ হাজির হইয়াছে। বাহিরেই শুনিল কর্তার শেষ অবস্থা, এ-যাত্রা বুঝি আর টেঁকেন না। বাড়ি আসিবার সময় হারাধন বরাবরই একটু অপ্রকৃতিস্থ থাকে, সেই জন্য যখন যে-ভাবের মধ্যে আসিয়া পড়ে সেই ভাবটার একটু বাড়াবাড়ি হইয়া দাঁড়ায়। ঘটা করিয়া কান্নাকাটি শুরু করিতে যাইবে, সবাই বলিল—আগে গিয়া একবার দেখা করা দরকার বাপের সঙ্গে। ধরিয়া উঠাইয়া ভিতরে লইয়া যাইতে মেয়েদের মধ্যে চাপা কান্না উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, হারাধন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল, বলিল—"তোমরা ছেড়ে দাও আমায়, আমি এ মুখ আর দেখাব না বাবাকে!" অসুখের বাড়িতে এ আবার একটা উলটা হিড়িক দাঁড়াইল, ছেলের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ হওয়াটা নিতান্ত দরকার, আসিয়াই যখন পড়িয়াছে। ছেলে কিন্তু কোট ধরিয়া বসিল—এ মুখ আর দেখাইবে না। শেষে একজন আত্মীয় জেঠাইমা আসিয়া বলিল—"মুখ কি আর দেখতে পাচ্ছেন রে বাবা? সে ভয় তোর নেই—দেখলেও যে চিনতে পাচ্ছেন না। তুই চল নিশ্চিন্দি হয়ে শুধু একটু সামনে দাঁড়াবি। বাপই তো, মুখ না দেখাস, দেখবার ইচ্ছেটাও তো হতে হয় একবার।"

বিপদটার একেবারে সামনাসামনি হইয়া হারাধনের নেশাটা একটু

পাত্‌লা হইয়া আসিল। জ্বরের ঘোরে বাবা তখন অচৈতন্য হইয়া পড়িয়া আছে, একবার একটু জ্ঞানের মতো হইয়া বিড়বিড় করিয়া কি বকিয়াও গেল, দু'একজন কানের কাছে ঝুঁকিয়া বেশ একটু জোর আওয়াজেই জানাইল হারাধন আসিয়াছে। রোগী কিন্তু আবার নিঃসাড় হইয়া পড়িল।

হারাধন জিজ্ঞাসা করিল—"চিকিচ্ছে কিছু হচ্ছে, না, কাঙালি জ্যেঠাকেও ব্ল্যাক মার্কেটে চড়াবার মতলব করেছে?"

সকলে জানাইল চিকিৎসা পুরাদমেই চলিতেছে, এদিক'কার ডাক্তার তো আছেই, তাহার ওপর মানসিক ডাক্তারও আসিতেছে।

হারাধন ঘুরিয়া পাত্‌লা নেশার ঢুলঢুলে চোখে খানিকক্ষণ বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর জড়িত কণ্ঠে বলিল—"মানোসী!—এই প্রথম শুনচি, চাঁদসীদের জ্ঞাতিভাই নাকি?"

সকলে যেমন শুনিয়াছে তাহাদের পদ্ধতিটা বুঝাইয়া দিল। রোগীর কথাবার্তা শুনিয়া তাহারা একেবারে মনের মধ্যে ঢোকে, তারপর সেইখান থেকে একেবারে রোগের গোড়া ধরিয়া চিকিৎসা করিতে করিতে উঠিয়া আসে।

হারাধন একটু বুঝিবার চেষ্টা করিয়া খানিকটা রাগিয়াই উঠিল, চোখে একটু চাড়া দিয়া বলিল—"মনের মধ্যে ঢুক্‌বে! তাদের ঘরে ঢুকতে দিলে কে! কাঙালি কোথায়?"

কাঙালি হারাধনকে এড়াইয়াই চলে, তাহাকে পাওয়া গেল না। খানিকক্ষণ আবার চুপ করিয়া রহিল হারাধন, চিন্তা করিতেছে, সঙ্গে সঙ্গে ঢুলিতেছেও একটু একটু, তাহার পর প্রশ্ন করিল—

"তা, পারলে ঢুকতে তাদের মধ্যে কেউ?"

সকলে সে-ইতিহাসটাও জানাইল। চেষ্টা করিয়াছে, তবে রোগী আগা-গোড়াই বিভ্রান্ত বকিতেছে, তাহারা বলিতেছে, সাধারণ চিকিৎসকে একটু যদি চাঙ্গা করিয়া দিতে পারে, রোগী এক-আধটাও সুসংলগ্ন উত্তর

দেয় তো তাহারা সেইটুকুর সূত্র ধরিয়াই তাহাকে দাঁড় করিয়া দিতে পারে।

"হুঁ···এরা কি বলছে ?"

"এরা বলছে, তবে আর ওদের ডাকা কিসের জন্যে ?"

"হুঁ !···শিবের গুরু রাম, রামের গুরু শিব, বুঝেছি ! কত দুইলে দু'দলে জোট করে ?"

ইহার পর আর একটা দীর্ঘতর 'হুঁ'—উচ্চারণ করিয়া হারাধন আবার চুপ করিল। এবার অনেকক্ষণ গেল, চোখ দুইটি বোজা, মাঝে মাঝে মাথা দোলানো থেকে মনে হয় গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। ইতিমধ্যে রোগী বার তিনেক প্রলাপ বকিল, সেটাও মন দিয়া শুনিল হারাধন—"বিশ লাখ—খেতে পেলে না,···সরা বোরাগুলো—ফেলে দে ফেলে দে !"—তাহার পর এক সময় চোখ খুলিয়া বলিল—"হয়েছে, ডাকো তাদের, আগে মান্‌সীর দল।"

হারাধনের নির্দেশে গদির মুহুরিদের মধ্যে যে সব চেয়ে বড়ো—একজন পাকা-চুল বৃদ্ধ—তাহাকে ডাকিয়া আনা হইল। হারাধন বাহিরে এক প্রান্তে গিয়া তাহাকে চুপি চুপি কি একটা কথা বলিয়া পিঠে মৃদু করাঘাত করিল, বলিল—"চট্‌-পট—এক্ষুণি বসে যান।"—তাহার পর ভেতরে আসিয়া রোগীর কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বেশ জোরেই ডাক দিল—"জ্যেঠামশাই ! জ্যেঠামশাই !!"

হারাধনের মা কানে আঙ্গুল দিয়া হন্‌ হন্‌ করিয়া বাহিরে চলিয়া গেল। আত্মীয় জ্যেঠাইমা আর দু'একজন একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"ও হারাধন, বাপ যে ! এই কি তোর নেশা করে জ্ঞান হারাবার সময় বাবা ?"

হারাধন ইঙ্গিতে তাহাদের চুপ করিতে বলিয়া আবার ডাকিল—"বলি জ্যেঠামশাই !—শুনছেন ?"

কি হইল বলা শক্ত, তবে "অঁ... ?" করিয়া একটা যেন উত্তর দেওয়া গোছের শব্দ করিয়া রোগী পাশ মোড়া দিল।

হারাধন আবার কানের কাছে গিয়া হাঁকিল—"জ্যেঠামশাই! আমি কাঙালি—ফিরলুম দিনাজপুর থেকে!"

রোগী পিট পিট করিয়া চাহিল, কিন্তু বুদ্ধির দীপ্তি নাই, সংজ্ঞাটুকু

প্রলাপে গড়াইয়া পড়িল—"সরা বোবা—সরা—সরা! বিশলাখ... বিশলাখ মোলো! ·"

হারাধন ঢুল-ঢুল চোখে একবার ঘুরিয়া সবার দিকে চাহিয়া মুচকি হাসিল, বলিল—"বললুম না তখন? শালা বৈরিগী আমার বাবার মনে

অনুতাপ সাঁদ করিয়ে গেছে!"—তাহার পর আবার কানের কাছে মুখ লইয়া গিয়া বলিল—"তা মরুকগে, এদিকে একের দশ!..."

রোগীর চোখে একটু যেন বুদ্ধির দীপ্তি আসিল, দৃষ্টি ঘুরাইয়া একটু দেখিল, তারপর প্রশ্ন করিল—"লাভ হোল?"

"হ্যাঁ, তবে আর বলচি কি?—সেই দশ হাজারের লট্‌টা লাখে দাঁড়িয়েছে!"

রোগী বেশ বুদ্ধিদীপ্ত চোখে আবার চারিদিকে চাহিল, বেশ ভালো ভাবেই সবাইকে চিনিতেছে, একটু আচ্ছন্নভাবে বলিল—"হারাধন না?... স্বপ্ন দেখছিলুম কি?—মেলা পেয়াদা—চারিদিক থেকে নালিশ করছে... আর কি দুশমন চেহারা পেয়াদা-বেটাদের! সবাইকে সরে যেতে বল্ দিকিন একবার..."

"তুমি ভেবো না, ওসব পেয়াদারও উপায় আছে, সবই তো চাঁদির খেলা। ঘুমটা ভেঙে কেমন বোধ হচ্ছে? দু'নম্বরের গুদোমটাও দেবে খুলে?"

নবীন কুণ্ডু একটু চাড়া দিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে সবাই তাকিয়ার সাহায্যে আধ-শোয়া করিয়া বসাইয়া দিল। মনের দিক দিয়া তো আচ্ছন্নতার ভাব নাই, শরীরের দিক দিয়াও অনেকটা চাঙ্গা, বলিল—"দশ হাজারের ইস্টক্‌টা এক লাখ দিলে!...এ্যাঁ, কি বললে?—হ্যা, ঘুম ভেঙে ভালোই বোধ হচ্ছে...ইয়ে, মুহুরি গুরুচরণকে ডাকিয়ে পাঠাও তো—খাতাটা নিয়ে...আর আমার গড়গড়াটা..."

মনঃসমীক্ষকরা দুজন আসিল। নবীন কুণ্ডু তখন বাঁ হাতে গড়গড়ার নল লইয়া খেরোর বইয়ের পাতা উল্টাইয়া দশ হাজার থেকে এক লাখের হিসাব দেখিতেছে। চোখটা তুলিয়া দুইজন ভদ্রলোককে সামনে দেখিয়া একটু অন্যমনস্কভাবে বলিল—"কি দরকার?...হচ্ছে, বসুন একটু।... কিন্তু দর চড়েছে, আর ও-দরে ছাড়তে পারব না..."

এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেছে। ছাতা সঙ্গে আছে তবুও দ্বিতীয় পশলা নামিবার পূর্বে বাসায় পেঁাছান নিতান্ত দরকার, ত্রস্তপদে চলিয়াছি, এমন সময় ভদ্রলোক পিছন থেকে আসিয়া সঙ্গ লইলেন, আলাপের সূত্রপাত করিলেন—"এই যে আপনার ছাতা আছে দেখছি।"

বয়স মনে হইল ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের মধ্যে। উগ্র রকম শৌখিন,—ছিপছিপে চেহারা, ফিনফিনে ধুতি পায়ের গোছের নিচে লুটাইয়া পড়িয়াছে, কষ্ট্যুম-গেঞ্জির ওপর অরগ্যাণ্ডি কাপড়ের পাঞ্জাবী, হাতে একটা চেরিউডের পাত্‌লা ছড়ি। মোট কথা, ছাতা বহিবার পাত্র নয়।

আমি হাসিয়া বলিলাম—"হ্যাঁ, ছাতা যে আছে তার আরও প্রমাণ আছে।"

পাঞ্জাবীটা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া, কাপড়টা হাঁটু পর্যন্ত গুটাইয়া লইয়া মেঠো চালে আসিতেছিলাম, হাতটা আলগা করিয়া দিলাম এবং পাঞ্জাবীটাও কাঁধ থেকে নামাইয়া মেলিয়া ধরিলাম। ভদ্রলোক, বৃষ্টি হইলে ছাতার নিচে একেবারেই ঘেঁষাঘেঁষি চলিতে হইবে বলিয়া একটু কাছেই ঘেঁষিয়া আসিয়াছিলেন, একেবারে তিন হাত তফাতে সরিয়া গিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন—"এ কি! কাঁচা রং না কি?"

বলিলাম—"হ্যাঁ, জল-কাচ করলেই ধুয়ে যাবে, কোন ভয় নেই।"

ভদ্রলোক আরও হাত-খানেক সরিয়া গেলেন, বলিলেন—"মাফ করবেন, ও-ছাতার নিচে আর যাই?"

ভুল হইয়া গিয়াছিল,—অতিরিক্ত শৌখিন জামা-কাপড় নষ্ট করায় একটা বর্বর আনন্দ পাওয়া যায়, হঠাৎ কি করিয়া সেই ঝোঁকে পড়িয়া

গিয়াছিলাম, ভদ্রলোকের সন্ত্রস্ত ভাব দেখিয়া একটু লজ্জিত হইয়াই হাসিয়া বলিলাম—"না, আসুন, ও-ছাতা কি আর নিজেই খুলি আমি ? তবে ঐ, আপনাকেও সাহায্য করতে পারলাম না। তা অন্তত ভেজার সঙ্গী তো পাবেন একজন, সেটাও কম লাভ নয়।—কত দূর যাবেন ?"

"ক্যান্টর টাউন। ঢুকতেই আমার বাসা।—আপনি ?"

"ঐ দিকেই, তবে অনেকটা ভেতরে গিয়ে।"

"বেশ চলুন, আমার ওখানেই জামা-কাপড় ছেড়ে নেবেন, তার পর চা খেয়ে বেরিয়ে পড়বেন। না, বেশ ভিজে গেছেন।"

"আজ্ঞে না, তার দরকার হবে না, মাফ করবেন।"—এবার আমিই যে ভীত হইয়া পড়িয়াছি, কণ্ঠস্বরে সেটা বেশ স্পষ্টই প্রকাশ হইয়া পড়িল ; ভদ্রলোক একটু বিস্মিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"কেন ?"

বলিলাম—"না, সাদা জলে ভেজা নয় তো, দেখতেই পাচ্ছেন ছাতার কালি একেবারে ভূত করে দিয়েছে, এ অবস্থায়—"

"কিন্তু যা করে দিয়েছে তা তো দেখেই ফেললাম, তখন আর আপত্তি কি থাকতে পারে ?"

আমি একটু কুণ্ঠিত দৃষ্টিতে চাহিলাম। ভদ্রলোক তবুও বিস্মিত ভাবে চাহিয়া আছেন দেখিয়া বুঝিলাম, বুদ্ধিটা শরীর বা বেশভূষার অনুরূপ সূক্ষ্ম নয়, তখন নিরুপায় হইয়া আরও স্পষ্ট করিয়া বলিতে হইল—"এ-অবস্থায় মহিলাদের সামনে, এমন কি ছোট ছেলেমেয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ান…বুঝতেই পারেন।…বাড়িটা তো দেখেই যাচ্ছি, অন্য একদিন এসে আলাপ-পরিচয় করা যাবে তখন।"

এইটুকুই ভদ্রলোকের চরিত্রের দুর্বল স্থানটিতে সোজাসুজি গিয়া ঘা দিল এবং তিনি প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁহার ছোড়দির প্রসঙ্গ আরম্ভ করিয়া দিলেন।—

এ রকম অবস্থায় গিয়া শুধু এক ছোড়দির সামনে দাঁড়ানই

বিপজ্জনক—মুখে কিছুই বলিবেন না, বরং এমন ভালো মানুষের মতো মুখটি করিয়া দাঁড়াইবেন, মনে হইবে লোকটি নাকাল হওয়ায় মনে মনে যেন সব চেয়ে তিনি বেশিই দুঃখিত। শুধু ঠোঁটে খুব অল্প একটু হাসি, খুবই অল্প, এত অল্প যে যাহার জানা নাই সে ধরিতেই পারিবে না। তাহার পর কোনখানে চুপটি করিয়া বসিয়া ঐ নাকাল হওয়া লইয়াই এক লম্বা ছড়া। খানিকক্ষণ পরে শোনা যাইবে যত ছেলে-মেয়ে আছে বাড়িতে সবার মুখে-মুখে সেই ছড়া ঘুরিতেছে! কে একটু আছাড় খাইল, কে আছাড় খাইতে খাইতে সামলাইয়া লইল, কাহার কথায় একটু বেফাঁস হইয়া বক্তাকে অপ্রতিভ করিয়া দিয়াছে, সব কিছুর ইতিহাস জমা থাকা চাই ছোড়দির ছড়ায়। নাকাল করিতে পারিলে আর কিছু চায় না ছোড়দি।...সে-দিক্ দিয়া সম্পর্ক-জ্ঞানের বালাই নাই। বড়দা'ও তেমন অবস্থায় পড়িলে রেহাই পায় না, আর ঠাট্টার সম্পর্কের কেহ হইলে তো কথাই নাই, বাড়ির জামাই হোক্ জামাইয়ের আত্মীয় হোক্, ছোড়দির সামনে একবার পড়িলে হইল। ছোড়দির ভয়ে বাড়ির সবাই কাঁটা হইয়া আছে, অথচ এক দণ্ড যদি বাড়ি না থাকে বাড়িটা যেন খাঁ-খাঁ করিতে থাকে—ভয়ঙ্কর আমুদে মানুষ যে এদিকে!—ছোড়দি এখানে থাকিলে কি ভদ্রলোক আমায় আহ্বান করেন। ছাতার কালিতে সং সাজিয়া এক জন ভিজিতে ভিজিতে বারান্দায় আসিয়া উপস্থিত হইল—ছোড়দি তো তাহা হইলে একটা মহাকাব্য রচনা করিয়া বসিবে। ভদ্রলোক জানিয়া-শুনিয়া কি আমায় বাঘের মুখে তুলিয়া দিতে পারেন?

বলিলাম—"তিনি থাকলে, যেমন বলছেন, যথেষ্টই ভয়ের কারণ হোত, তবু অন্য কারুর সামনেও এ অবস্থায় গিয়ে ওঠা খুবই অস্বস্তিকর নয় কি? দেখলে, নিতান্ত যে ভালো মানুষ তারও যে ছড়া কাটবার লোভ উদয় হবে মনে। তা ছাড়া ছড়ার ভয় না থাক,

নিজের শালীনতা-জ্ঞান আছে তো মানুষের?...আর আপনার সঙ্গে দেখা না হলে তো বাসাতেই যেতাম চলে বরাবর?"

ভদ্রলোক জানাইলেন মেয়েছেলের পাটই নাই বাসায়, তিনি ওদিক্ দিয়া একেবারে একক, থাকার মধ্যে একটি চাকর আর একটি পাচক ব্রাহ্মণ, এইখান থেকে জোগাড় করা। পূজার সময়টা কাটাইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, তাহাও মাত্র কয়েক দিন হইল, এখনও ভালো করিয়া আলাপ-পরিচয়ও হয় নাই কাহারও সহিত।

আবার ছোড়দির কথা আসিয়া পড়িল। ভদ্রলোক তন্ময় হইয়া গিয়া মাঝে মাঝে আকাশের কথা ভুলিয়া যাইতেছেন, মনে করাইয়া দিতে হইতেছে। এই অবস্থায় প্রায় সন্ধ্যার সময় তাঁহার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলাম।

২

ভদ্রলোকের নাম হিরণ্ময়। ক্রমে ঘনিষ্ঠতা হইল। উনিও আসেন আমিও যাই, তবে আমার যাওয়াটাই বেশি, কেন না আমার বাসায় আরও পাঁচ জন আছে, গল্প করিতে বেশ জুৎ পান না উনি। এদিকে লোক বেশ ভালো। প্রচুর আদর-আপ্যায়ন, জলখাবারের হিসাব নাই। এ বিষয়ে বেশ সৌখিনও, পাচকটিও পাইয়াছেন বড় ভালো। সবই ভালো, এক ঐ ছোড়দি ছাড়া। ক্রমে বুঝিলাম ভদ্রলোকের আলাপ-পরিচয় যে বেশি নাই তাহার কারণও ঐ ছোড়দি! এ রকম অভ্যর্থনায় এ বাসায় স্বাস্থ্যান্বেষীদের দলে দলে ভাঙিয়া পড়িবারই কথা, কিন্তু বেশ বোঝা যায়, দেওঘরের পাহাড়ী জলেও অত 'ছোড়দি'-মিশ্রিত খাদ্য তাহাদের দুষ্পাচ্যই হইয়া পড়ে। ভদ্রলোকের এই দুর্বলতাটুকুর সুযোগ গ্রহণ করিবার মতো লোক যে একেবারেই নাই এমন নয়, আসে, ওষুধ-

গেলা করিয়া গল্পগুলা শোনে, আহার করিয়া ভদ্রতার খাতিরে খানিকক্ষণ বসেও, তাহার পর একটা-না-একটা ছুতা করিয়া চলিয়া যায়। আমি আসিও বেশি, আসিলে বসিয়াও থাকি অনেকক্ষণ, কেন না পেটের খোরাকটা আমার গৌণ, লক্ষ্য থাকে লেখনীর খোরাকের ওপর। প্রবাসে বেশি মেশামেশির জন্য ওঁর এই দুর্বলতাটুকু বোধ হয় একটু অবহেলার চক্ষেও দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িতেছি ক্রমে ক্রমে, মোটের উপর আমি আসিলে দু'জনে ভালোই জমে, আমিও শরীর এলাইয়া দিই, উনিও মনের কপাট দেন খুলিয়া। এক-এক দিন রাত্রি হইয়া যায়, রাত্রের আহার ঐখানেই সমাধা করিতে হয়, পাচক একটি দ্রব্য আনিয়া উপস্থিত করে, ছোড়দির গল্পের এক একটি অধ্যায় চলে বাড়িয়া—

"শুনছেন শৈলেন বাবু?—এই মাছের ফ্রাই—আচ্ছা আগে আপনিই বলুন, কি রকম লাগছে আপনার?"

আস্বাদ গ্রহণ করিয়া বলি—"কেন, ভালোই তো করেছে, আপনার কি রকম মনে হয়?"

হিরন্ময় বাবু একটু মুচকি হাসিয়া মাথাটা অল্প অল্প দোলান, বলেন—"না, খারাপ হয়নি, সে কথা বলছি না, লোকটা রাঁধে ভালোই।—তবে কথা হচ্ছে—তা আপনাকে দোষ দোবই বা কি করে?—ছোড়দির হাতের রান্না তো খান নি? ফ্রাই খেয়েছি অনেকের হাতেই, গ্রেট ইষ্টার্ণও বাদ যায় নি, ছোড়দির হাতের ফ্রাই—সে এক জিনিসই আলাদা মশাই। এই তো এ-ব্যাটা করেছে ভালোই, এমনি অন্যমনস্ক ভাবে খেয়ে গেলে ভালোই লাগত, কিন্তু ঐ যে আপনাকে জিগ্যেস্ করতে গিয়ে ছোড়দির ফ্রাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল, ব্যাস, আর চলবে না, ফিকে মেরে গেছে!"

সেই মৃদু হাসিটা প্রসারিত হইয়া যায় আর একটু। ফিকে লাগিয়া

যাওয়ার প্রমাণ-স্বরূপ ফ্রাইয়ের খণ্ডটা আস্তে আস্তে সরাইয়া রাখিয়া আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকেন। একটা জিনিস পাশেই এক জনের রসনায় বিস্বাদ লাগিল বলিয়া প্রত্যাখাত হইল, অথচ অপর এক জন তৃপ্ত লুব্ধতায় বেশ খাইয়া যাইতেছে—বেশ একটু অস্বস্তিতে পড়িয়া যাইতে হয় আমায়। হিরণ্ময় বাবু কিন্তু এতই ছোড়দিতে বিভোর যে সে দিকে ভ্রূক্ষেপও নাই, পাচককে ডাকিয়া বলেন—"ঠাকুর, আর কিছু করেছ, না, বাবুকে তোমার ফ্রাইয়ের নমুনা দেখিয়েই বাড়ি পাঠিয়ে দেবে ?"

ঠাকুর হয়তো প্লেটে করিয়া দুইখানি অমলেট আনিয়া হাজির করিল। হিরণ্ময় বাবু অল্প একটু ব্যঙ্গ-হাস্যের সঙ্গে হাতটা কোলের দিকে টানিয়া লইয়া একটু যেন গুটাইয়া বসিলেন, বলিলেন—"নাঃ, আজ তুমি আমার খাওয়া বন্ধ করার ব্যবস্থা করেছ ঠাকুর—"

কি মন্তব্য আসিতেছে আন্দাজ করিয়াও আমি একটু বিস্ময়ের অভিনয় করিয়াই প্রশ্ন করি—"কেন, কি হোল বলুন তো ?"

"ঐ যে বললাম, যাতে-যাতে ছোড়াদির হাত বিশেষ করে খোলে, বেছে বেছে সেইগুলি রেঁধেছে আজ। অন্য দিনও যে না রাঁধে এমন নয়, অন্যমনস্ক হয়ে খেয়েও যাই বেশ, কিন্তু আজ ঐ যে বললাম, একবার যখন ছোড়দির হাতের কথা মনে পড়ে গেছে—"

নিজের অপ্রতিভ ভাবটা চাপা দিবার জন্যই এক এক সময় একটু বলিতেও হয় কিছু, বলি—"এ যে আপনার বরে শাপ হয়ে দাঁড়াল হিরণ্ময় বাবু। না, একটু মনের জোর করে তাঁকে ভুলুন, দেওঘরের জল, এখানে উপোস দিলে যে নাড়ি হজম হয়ে যাওয়ার ভয় আবার। শেষে উপোসের পেটে একটা ব্যামো-ট্যামো হয়ে অমন ছোড়দির হাতের রান্না খাওয়ার পাটই উঠিয়ে দেবেন ?"

একটু কামড় দিয়া উৎসাহিত করিবারও চেষ্টা করি, বলি—"না,

নিতান্ত খারাপ হয় নি, দেখুন না, ঘিটাও ভালো পাচ্ছেন এখানে, বেশ স্বাদ খুলেছে।”

হিরণ্ময় বাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—“তাহলে আপনাকে সেদিনকার গল্পটা একবার শুনিয়ে দিতে হচ্ছে একটু। বাড়িতে ফ্রাই, চপ আর অমলেটের কম্পিটিশ্যন—বৌদি, ছোড়দি আর ছোট খুড়িমা। আমি ছুটিতে গেছি, আমার ওপর দিয়ে পরীক্ষা হবে। খুড়িমা তার বাপের বাড়ি থেকে একেবারে খাঁটী গাওয়া-ঘি জোগাড় করেছে, বৌদি পরেশদা'কে দিয়ে এক নম্বর লার্ড আনিয়েছে, একেবারে গ্রেট্ ইষ্টার্ণের রান্নাঘর থেকে—সব চুপি চুপি—নিজের নিজের মশলা, নিজের নিজের ভাজার সরঞ্জাম—নিজের নিজের রান্না, কেউ কাউকে হেকমৎটা জানতে দেবে না তো! পরীক্ষার পদ্ধতিটাও লক্ষ্য করবেন—সে-ও ওই ছোড়দির ব্রেণ—প্রত্যেক প্লেটে মাল থাকবে মেশানো—ছোড়দির চপ তো বৌদির অমলেট, খুড়িমার ফ্রাই। এ-রহস্যটুকু আবার আমার কাছ থেকে গোপন রাখা হোল। তিনখানি প্লেট সামনে এসে পড়ল···ঠাকুর, বাবুকে আর একটা অমলেট দিয়ে যাও।”

বলিলাম—“তা দিক, হয়েছে ভালো। আপনিও দেখুন না মুখে দিয়ে একটু।”

হিরণ্ময় বাবু সেই প্রশ্রয়ের মৃদু হাস্যের সহিতই বলিলেন—“আগে গল্পটাই শুনে নিন, তার পর পারেন, অনুরোধ করবেন।···তিনটি প্লেট সামনে এসে পড়ল, সবাই ঘিরে বসে। ন'টিকে আস্তে আস্তে শেষ করে বললাম—এই প্লেটের চপ, এই প্লেটের ফ্রাই আর এই প্লেটের অমলেট আর একটা করে চাই আমার···”

হিরণ্ময় বাবু চোখ দুইটা বড় বড় করিয়া সেই হাসিটিকে আরও একটু বিস্তারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন, নূতন অমলেটটা চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম—“ছোড়দির নিশ্চয় ?”

সোজা উত্তর দেওয়া দরকার মনে করিলেন না হিরণ্ময় বাবু, বলিলেন —"সে এক ওয়াণ্ডারফুল জিনিষ মশাই! অথচ ছোড়দি অত সরঞ্জামের ঘটার দিকে মোটেই যায় নি, ভেজেছে পর্যন্ত বললে ভোজটেবল ঘিয়ে— বাজারের যা ওঁচা জিনিস!"

এমন অসম্ভব রকম কাণ্ডে বিস্মিত হইয়া বলিতেই হয়—"আশ্চর্য হাত তো!—কিন্তু আপনার ক্ষমতাটাকেও বলিহারি দিতে হয় সেই সঙ্গে—"

হিরণ্ময় বাবু নিতান্ত আত্ম-অবহেলার স্বরে বলিলেন—"আমার কথা বলছেন? আমাব আর কি বাহাদুরি আছে এর মধ্যে? ঐ যে বললাম— ছোড়দির হাতের তাব যে পেয়েছে সে তো একেবারে বাঁধা পড়ে গেল কি না, অন্য হাত যে একেবারে ফিকে ঠেকতেই হবে তার মুখে। ও তো তিন জন, আমি যে লাখের মধ্যে ছোড়দির রান্না বেছে নোব কি না, সে পরীক্ষাও হয়ে গেছে—"

আরব্য-রজনীব মতো একটার গায়ে একটা কাহিনী আসিয়া পড়ে, বাসা বেশ খানিকটা দূব, আমি একটু ভয়ে ভয়ে বিস্ময়ের ভান করিয়া বলি—"এক দিন শুনতে হবে তো!—ঠাকুব, আর কি আছে?"

হয়তো পায়সের মতো শেষ-পাতের কোন জিনিস আসিয়া উপস্থিত হইল। ছোড়দির স্মৃতির উপদ্রবে সব জিনিস ঠেলিয়া রাখায় ক্ষুধাটা নিশ্চয় চাগাইয়া উঠিয়াছে, সেই জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক, হিরণ্ময় বাবু খানিকটা আহার করিয়া গেলেন। নিজেও অসঙ্কোচে খানিকটা গলাধঃকরণ করিয়া একটু উৎসাহের সঙ্গে বলিলাম—"এটা বোধ হয় আপনারও মন্দ লাগল না, তবে কি তাঁর হাতের মতন হয়েছে কতকটা?—তাহলে আমিও খানিকটা আইডিয়া করে নিতে পারি। একটা গল্প করবার মতো কথা তো?"

হিরণ্ময় বাবু হাত থামাইয়া বলিলেন—"

জিনিসের ধার দিয়েই যায় না ছোড়দি—পায়েস বলুন, রাবড়ি বলুন, ক্ষীর বলুন—"

প্রশ্ন করি—"ডালনা, ঘণ্ট, শুক্ত ?—ওদিকে তরকারির মধ্যে ?—"

"ধার মাড়ায় না, বলে, ঠানদিদিদের রান্না ও-সব।"

"তাহলে তো এক কাজ করতে পারেন, যত দিন এখানে আছেন, ঠাকুরকে ঐ সবই রাঁধতে বলুন না—মানে, কোন রকমে পেটটা না ভরালে—"

"তাও কি রোজ রোচে মুখে মশাই ? তবে আর বলছি কি ?—এমন-বদ অভ্যেস করে দিয়েছে ছোড়দি ঐসব খাইয়ে খাইয়ে—"

হাসি চাপিয়া রাখা শক্ত হইয়া পড়ে, বলি—"আপনার দেখছি তাহলে সমস্যা দাঁড়িয়ে গেছে ভীষণ—মেয়েরা সেই যে বলে—এক দিকে আস্তাকুড়, এক দিকে বড় ঠাকুর, তাই।—এ অবস্থায় ছোড়দিকে সঙ্গে আনলেই ভালো করতেন—এখনও লিখে দিলে তিনি আসেন না ?"

৩

দিন-চারেক পরের কথা।

নিজের বাসাতেই বারান্দায় বসিয়া রেডিয়োতে একটা গান শুনিতেছি, জানালার মধ্যে দিয়া বাহিরে নজর পড়িতে দেখি, খানিকটা দূরে হিরণ্ময় বাবু হন্-হন্ করিয়া চলিয়া আসিতেছেন। লুকাইয়া ফল নাই, মনে মনে একটু ।বরক্তই হইলাম, ওঁর আসার জন্য নয়, ছোড়দি আসিয়া পড়িবেন বলিয়া। বেশ আমেজময় আতপ্ত সকালটি শরৎ কালের, লক্ষ্ণৌয়ের বিশেষ প্রোগ্রামে চমৎকার একটি ঠুংরি ধরিয়াছে, নরম টিউনে রেডিয়োটি

স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি, হয়তো সেই মারাত্মক মৃত্যু

হইবে—ঠুংরি শুনিতে হয়তো ছোড়দির গলায়,

আর সবই বাতিল। তাহার পর সেই মন্তব্যের বিশ্লেষণ আরম্ভ হইবে—ছোড়দির গলার কর্তব, গমক, চড়ায় কোথায় গিয়া ঠেকে, খাদে কত নিচু পর্দা পর্যন্ত নামিয়া আসে। তাহার পর আসিবে উদাহরণ, ছোড়দির যখন কম বয়স, বিবাহ হয় নাই, কোথা থেকে কাহারা কবে দেখিতে আসিয়াছিল, কোন্ বারে কি গান গাহিয়াছিল ছোড়দি, কি তাহার পরিণাম হইয়াছিল। কাহার বাসরে কি গান গাহিয়া, কি অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিল। কবে পথ চলিতে চলিতে ওস্তাদ কোন্ খাঁ ছোড়দির গলা শুনিয়া নিজে হইতে বৈঠকখানায় উঠিয়া আসিয়া কি মন্তব্য করিয়া গিয়াছিল—অসহায় ভাবে বসিয়া বসিয়া শুনিয়া যাইতে হইবে। কয়েক বারই এই রকম হইয়া গেছে, আজ প্রোগ্রামটি ভালো, কাগজে দেখিলাম কয়েক জায়গা থেকে নাম-করা গাইয়ে-বাজিয়ের সমাবেশ হইয়াছে, ছোড়দির ভাই আসিয়া এমন আসরটি নষ্ট করিয়া দিবে, ভাবিতেও মনে-মনে ব্যথিত হইয়া উঠিলাম।

চক্ষু বুজিয়া ছিলাম, আসন্ন বিপদের মুখে যতটুকু ভালো করিয়া উপভোগ করিয়া লইতে পারি, এমন সময় বাগানের কাঁকরের রাস্তার ওপর জুতার শব্দ জাগিয়া উঠিল। চক্ষু খুলিয়া কাছে থেকে হিরণ্ময় বাবুর চেহারা দেখিয়া বেশ একটু বিস্মিতই হইয়া উঠিলাম—চুলগুলো উস্কখুস্ক, মুখে গভীর উদ্বেগের ভাব, জামা-কাপড়েও সে অভ্যাসগত পারিপাট্য নাই, গতিও খুব ত্রস্ত—উঠিয়া আগাইয়া গিয়া বলিলাম—"আসুন হিরণ্ময় বাবু! অসময়ে যে? একটু যেন ব্যস্তও দেখছি! কোন রকম—?"

হিরণ্ময় বাবু কোন উত্তর না দিয়া গম্ভীর ভাবে সামনের চেয়ারটাতে বসিয়া পড়িলেন, বুক-পকেট থেকে খান পাঁচেক খাম-পোষ্টকার্ড বাহির করিয়া একখানি খাম আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"পড়ুন।" তাহার পর বিরক্তি ভরেই মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন।

বেশ একটু বিমূঢ় ভাবেই চিঠিটা খুলিয়া পড়িতে গিয়াই আবার একটু

জিভ কামড়াইয়া তাড়াতাড়ি মুড়িয়া ফেরত দিলাম, অন্যমনস্কতায় স্ত্রীর চিঠিটা দিয়া দিয়াছেন।

হিরণ্ময় বাবু চিঠিটা খুলিয়া দেখিয়া লইয়া একটুও অপ্রতিভ না হইয়া আবার পকেটে রাখিয়া দিলেন, একটু ভালো করিয়া চোখ বুলাইয়া অন্য একখানি খাম আমার হাতে দিয়া আবার মুখটা ঘুরাইয়া লইলেন। কয়েক লাইন পড়িয়া এটাও মুড়িয়া ফেরত দিবার জন্য হাতটা বাড়াইয়া বলিলাম —"এবারেও ভুল করেছেন হিরণ্ময় বাবু, বাড়ির চিঠি এটা।"

হিরণ্ময় বাবু ঘুরিয়া দেখিয়া লইয়া বলিলেন—"না, ঠিক আছে, পড়ুন না।"—

সঙ্গে সঙ্গেই হাতটা বাড়াইয়া বলিলেন—"বেশ, দিন।"—তাহার পর চিঠিটা পকেটে রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"বড়দির চিঠি মশাই, তিনি আসছেন, পরশু সকালের একস্‌প্রেসে!"

মুখটা খুব বেশি রকম অপ্রসন্ন।

ওদিকে আসিবার কারণও জানি না, এদিকে অপ্রসন্নতার কারণও জানি না, এ অবস্থায় কি মন্তব্য করিব ভাবিতেছি, হিরণ্ময় বাবু নিজেই যেন ফাটিয়া পড়িলেন—"একবার আক্কেলটা দেখুন মশাই! যেমন ভ্যাজাল এ্যাভয়েড্ করতে চাই তেমনি ঘাড়ে এসে পড়ে। আমি চাইছি পুজোর একটা মাস নিরিবিলিতে কাটিয়ে ফিরে যাব, চিঠি এসে হাজির বড়দি আসছেন—পরশুই—পরশু সকালেই, একটা চিঠি লিখে যে বারণ করব তার উপায়টি নেই!"

'ভ্যাজাল'-এর কথাতেই প্রশ্নই করিলাম—"বেশি দলবল নিয়ে আসছেন না কি?"

"না, আসছেন তো একলাই, মেজ ছেলেটিকে সঙ্গে করে, কিন্তু মেয়েছেলে যে মশাই, বুঝছেন না? একাই একশ'। কি করা যায় বলুন দিকিন? আমার তো মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে মশাই, আম কোথায় এলাম

হু'টো দিন নিশ্চিন্দি হয়ে একটু ঘুরে-ফিরে বেড়াব, বড়দি এসে হাজির! অত্যাচার নয়?—বলুন না। আমার তো এক-এক বার মনে হচ্ছে তালা-বন্ধ করে সরে পড়ি, উঠুন কোথায় এসে উঠবেন। শেষে মনে হোল শৈলেন বাবুর পরামর্শ নোওয়া যাক্ না হয়।"

আমি কি পরামর্শ দিব? আমার মাথাও গুলিয়া যাইতেছে। বড়দির আসায় এত বেশি আপত্তির কারণ কি থাকিতে পারে? ব্যক্তিগত মনোমালিন্য কি ঐ রকম পারিবারিক কোন কারণ থাকিলে সে-বিষয়ে প্রশ্ন করিতেও বাধে। আরও দুর্ভাগ্যের বিষয়, ছোড়দিই হিরণ্ময় বাবুর সব চিন্তা, সব আলাপ-আলোচনা এমন ভাবে জুড়িয়া বসিয়া থাকেন যে বড়দির উল্লেখও এই প্রথম তাঁর মুখে—তিনি কি, কোথায় থাকেন, ছোড়দির বড়দি হিসাবে তিনিও রন্ধন থেকে আরম্ভ করিয়া ছড়া-কাটা পর্যন্ত সকল বিষয়ে ছোট-খাট একজন সব্যসাচী কি না এ সব বিষয়ে কিছুই জানা নাই। কতকটা চিন্তার সময় লইবার জন্য এবং কতকটা তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্যও প্রশ্ন করিলাম—"ক'দিনের জন্য আসছেন আপনার বড়দি?—লিখেছেন তা কিছু?"

"পরশু মঙ্গলবার কি একটা যোগ না কি রয়েছে—লিখেছেন তুই যখন রয়েছিস ওখানে একবার ছুটে গিয়ে বৈদ্যনাথের মাথায় জল ঢেলে আসি। বাঙালী ঘরের বিধবা, বুঝছেন না, পরকাল পরকাল করেই সারা, মানুষ ইহকালেও যে একটু নিরিবিলিতে থাকতে চায় দু'দিন, সেদিকে খেয়াল থাকতে পারে কখনও? তাই না হয় এলেন, একটা কি দু'টো দিন চোখ-কান বুজে কাটিয়ে দিলাম, কিন্তু ভেবেছেন সঙ্গে সঙ্গে যাবেন চলে? অন্তত হপ্তা খানেক যদি বাসা আর মন্দির, মন্দির আর বাসা না করে কাটান্ তো কি বলেছি আপনাকে!—সাধ করে কি বলছি যে মাথা গুলিয়ে দিয়েছে?"

পরিচয় এবং উদ্দেশ্যটা জানা গেল খানিকটা, কিন্তু তাহাতে ভদ্র-

মহিলার প্রতিই সহানুভূতিটা বাড়িল মাত্র। সেটা কিন্তু বাহিরে প্রকাশ না করিয়া একটু ঘুরাইয়াই বলিলাম—"যেমন বলছেন তাতে খুব বেশি ক্ষতি হবে কি হিরণ্ময় বাবু?—আপনি আপনার ঘোরা-ফেরা নিয়ে থাকবেন, উনি ওঁর মন্দির নিয়ে থাকবেন।—আর যেমন ভয় করছেন, অত দিন নাও থাকতে পারেন—ছেলেটি আসছে, তার কলেজ বা স্কুল আছে নিশ্চয়—"

হিরণ্ময় বাবু যেন আমার ওপরও কতকটা নিরাশ হইয়া মুখের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি জানেন না বড়দিকে মশাই, তাই বলছেন ও-কথা—এর ওপর যদি আবার মাথায় সেঁদিয়ে যায় যে এই দশ-বারো দিন এসেও আমার শরীর তেমন সারে নি তো আর নড়তে চাইবেন ভেবেছেন না কি?—গ্যাঁট হয়ে বসে যাবেন—মণ্টুকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে। তার পর হবে রান্নার পর্ব শুরু—বাবা বৈদ্যনাথ পর্যন্ত কোথায় যে তলিয়ে যাবেন পাত্তাই পাওয়া যাবে না!"

বর্ধিত বিস্ময়ের ভাবটা চাপিয়া আবার একটু ঘুরাইয়াই বলিলাম—"হ্যাঁ, সে এক বিপদের কথা বটে, যে-মেয়েদের হাতে রান্না তেমন ভালো নয়, অথচ যাঁদের স্নেহের উপরোধও ঠেলতে পারা যায় না—"

হিরণ্ময় বাবু বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন—"রান্না ভালো না হলে তো পরিত্রাণ ছিল মশাই, বদ রান্না হবে আর ওষুধ গেলা করে উপরোধে পড়ে আমায় খেতে হবে, সে খাতির আমি রাখি না। কিন্তু রান্নার দোষ দিয়ে বড়দির হাতের তোয়ের জিনিস ঠেলে রাখবে এমন সাধ্যি কারুর দেখলাম না। বাড়িতে বড়দির পরেই রাঁধেন সেজ খুড়িমা, সেখানেও কিন্তু আকাশ-পাতাল তফাৎ। অবশ্য বিধবা হয়ে পর্যন্ত মাংস ছোঁন্ না, তেমনি ঠাকুর রয়েছে—সেদিক্ দিয়ে বাঁচোয়া নেই মশাই—সাধ করে কি ছুটে এসেছি আপনার কাছে?"

আরও বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। ভদ্রমহিলা ধার্মিকা, অত

নিবিড় ভাবে ভ্রাতৃবৎসলা। হিরণ্ময় বাবুর খাওয়ার সখ, সেদিক্ দিয়াও এমন দক্ষ যে অমন সে ভালেবর ছোড়দি তিনি এক কথাতেই গেলেন উড়িয়া। বাকি থাকে এখানে থাকার কথা—দুই দিনের জন্য তীর্থভ্রমণে আসিতেছেন দিন সাতেক থাকিয়া যাইতে পারেন, এমন কি শেষ পর্যন্ত, —কিন্তু সে তো বিপদ না হইয়া সম্পদই, এমন স্নেহপরায়ণা জ্যেষ্ঠাকে তো মাথায় করিয়া রাখা যায়—

চিন্তার মধ্যেই আর একটা কথা মনে পড়িয়া গেল। হিরণ্ময় বাবুর বাসায় রেডিয়ো আছে, ওটা আবার অনেকের কর্ণশূল, সেখানে ভাই-বোনের মধ্যে মতদ্বৈধ থাকিবার কথা। প্রসঙ্গটা আবার ঘুরাইয়াই উত্থাপন করিলাম, বলিলাম—"তবে হ্যাঁ, আপনার রেডিয়োটি বোধ হয় বন্ধ রাখতে হবে এ ক'টা দিন—অন্তত যতক্ষণ তিনি বাড়িতে থাকেন—"

"রেডিয়ো বন্ধ থাকবে কি মশাই!"—হিরণ্ময় বাবু যেন স্তম্ভিত হইয়া উঠিলেন—"এখানে রেডিয়ো না থাকলে সঙ্গে করে আনতেন। একটা দিন প্রোগ্রাম না শুনলে মাথা ধরে বড়দির, বিশেষ করে গানের প্রোগ্রাম। —বাবা ওস্তাদ রাখিয়ে গান শিখিয়েছিলেন—ওস্তাদ সমীম খাঁ, নাম শুনে থাকতে পারেন, ছেলেবেলায় কত কমপিটিশ্যনে যে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেয়েছেন।—রেডিয়ো না থাকলে আসতেন ভেবেছেন না কি?"

মাথাটা আরও গুলাইয়া আসিয়াছে, এমন কি কোনও দিকে পথ না দেখিয়া ভিতরে ভিতরে একটু উত্যক্তও হইয়া উঠিয়াছি। তবু হাসিয়াই বলিলাম—"তাহলে তাঁর আসায় আপত্তিটা কি হিরণ্ময় বাবু? আমার তো মনে হয়, তিনি না থাকতে চাইলেও বরং একটু জিদ করা উচিত থাকবার জন্যে। সত্যিই আপনার শরীরটা তেমন সারছে না, দেখছি তো ঠিক আপনাদের বাড়ীর ষ্ট্যাণ্ডার্ড অনুযায়ী পারছে না রাঁধতে ঠাকুরটা—"

হিরণ্ময় বাবু কিন্তু মনের বিরক্তিটা চাপিতে পারিলেন না, তবে সোজাসুজি না প্রকাশ করিয়া একটু কাতর ভাবে বলিলেন—"কিন্তু

ভ্যাজাল যে পছন্দ করি না মশাই, আসল কথাটা আপনি মিস্ করে যাচ্ছেন, আমি এলাম—পুজোর ছুটিটা রয়েছে, নিরিবিলিতে একটা মাস দেওঘরে না হয় কাটিয়ে আসি, চিঠি এসে হাজির বড়দি আসছেন!—"

তবুও হাল ছাড়িলাম না, বলিলাম—"হ্যাঁ, সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে একটু ইয়ে বটে—তা, তেমনি আপনার ভাগনে আসছে, ওঁর ওদিকটা সেই সামলাতে পাববে—"

"সেও তো একটা ভ্যাজালই। হয়তো ছোট মেয়েটাকেও সঙ্গে আনবেন, অথচ আমি চাই একেবারে নিরিবিলি—"

হার মানিয়াও করিলাম চেষ্টা একটু, বলিলাম—"একটু ভাবনার কথা বৈ কি। টেলিগ্রাম করে দিলে হোত ভালো, কিন্তু তার তো আর সময় নেই, এক্সপ্রেস টেলিগ্রামও চার দিনের কমে পৌঁছুচ্ছে না আজ-কাল—আসতেই দিন না হয়, তার পর—"

এ সমস্যার চেয়ে ছোড়দি ঢের সহনীয়, অন্ততঃ অভ্যাসে হইয়া দাঁড়াইয়াছে, ওদিককার কথা শেষ না করিয়াই বলিলাম—"হ্যাঁ, ভুলেই যাচ্ছিলাম, আজ লক্ষ্ণৌ রেডিয়োতে একটা স্পেশ্যাল প্রোগ্রাম ছিল—এই শেষ হোল একটু আগে, ধরেছিলেন না কি?"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিরণ্ময় বাবুর মনটা বড়দিব থেকে ছোড়দিতে আসিয়া পড়িল, মুখের বিরক্তির ভাবটা ব্যঙ্গে পরিবর্তিত হইয়া উঠিল, বলিলেন—"ঐ প্রোগ্রামেরই গান ছিল এটা, না? অন্যমনস্ক ছিলাম, ভালো করে কানে যায় নি—"

"হ্যাঁ, একটা ঠুংরি।"

"আমি এস্রাজে আশাবরীব গৎ শুনছিলাম, রাবিশ!—ভাবছি ছোড়দিও বোধ হয় সেখানে এ্যাটেণ্ড করছে, বোধ হয় হেসে সারা হচ্ছে মনে মনে এতক্ষণ—এমন সময় ডাকপিয়ন এসে হাজির!—ছোড়দির এস্রাজ বাজানোর একটা ইন্সিডেণ্ট তাহলে বলতে হোল—আপনাকে—"

সেইদিনকারই কথা—

একসঙ্গেই বেড়াইতে যাই। বৈকালে ওঁর বাসার দিকে যাইতেছি, দেখি হিরণ্ময় বাবু হন্-হন্ করিয়া এই দিকে আসিতেছেন। মুখটা দীপ্ত, দূর থেকেই একটু হাসিয়া বলিলেন—"ফাঁড়াটা কেটে গেল মশাই! এই—"

হাতে একটা টেলিগ্রাম ছিল, তুলিয়া ধরিলেন।

মনটা খুবই তিক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু জীবনে অনেক রকমারি 'চরিত্র'ই সহ্য করা অভ্যাস আছে, মনের ভাবটা মুখে না প্রকাশ করিয়া প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপার কি মশাই?"

"এলেন না, বাবা বৈদ্যনাথ ভক্তের চেয়ে অভক্তের কথাই বেশী শুনলেন. এই দেখুন না টেলিগ্রাম—ক্যান্‌সেল্ড লেটার ফলোজ—ভাবলাম শৈলেন বাবুকে দিয়ে আসি খবরটা। দেখি, চিঠিতে না আসবার কারণটা কি লেখেন।"

খুবই প্রফুল্ল। যাইবার সময় একবার বাসায় ঢুকিয়া ঠাকুরকে বলিয়া আসিলেন আমার রাত্রির আহার ঐখানেই হইবে। বেড়াইয়া আসিয়া রেডিয়ো শোনার পর আহারে বসিয়া দেখিলাম আয়োজনেরও বিশেষ ব্যবস্থার কথা বলিয়া গিয়াছিলেন। সব চেয়ে বিস্ময়ের কথা, সব পদগুলাই ছোড়দির বৈশিষ্ট্যসূচক হইলেও এবং হিরণ্ময় বাবুর মতে কোনটাই ছোড়দির হাতের রান্নার ধার দিয়া না গেলেও বেশ পরিতোষ সহকারেই আহার করিলেন। মনটা সত্যই খুব প্রফুল্ল। মামুলি ফাঁড়া নয়, যেন পুনর্জন্ম একেবারে।

কিন্তু তিন দিন পরে আবার যা দেখিলাম তাহার কাছে এ প্রফুল্লতা কিছুই নয়। আমার বিস্ময়েরও সেই দিন ছিল চূড়ান্ত। শুধু সেটা স্থায়ী হইতে পারিল না, কেন না একটি ছোট্ট কথাতে এত বড় রহস্যটা মুহূর্তেই যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল, যে ব্যাপারটাকে এত অস্বাভাবিক

বোধ হইতেছিল, দেখিলাম, মানব-ইতিহাসের আদি থেকে আজ পর্যন্ত তাহার মতো স্বাভাবিক কিছু তো সৃষ্টই হয় নাই।

একটি নূতন ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে, তিনিই আসিয়া আমায় অন্য দিকে বেড়াইতে লইয়া গেলেন। ক্লান্ত হইয়াই ফিরিলাম, কিন্তু রেডিয়োটা বিগড়াইয়া গেছে, রাত্রের খবরটা শুনিবার জন্য একবার হিরণ্ময় বাবুর বাসা থেকে ঘুরিয়া আসাই ঠিক করিলাম। উপস্থিত হইয়া দেখি বাসা একেবারে তোলপাড়। একরাশ টেবিল-চেয়ার বারান্দায় জড়ো করা, একটা বলদের গাড়িতে দু'টো কৌচ, খান তিনেক নেয়ারের খাট, একটা খালি গাড়িও আছে পাশে দাঁড়াইয়া। ওদিকে জন তিনেক কুলি বারান্দায় হুড়াহুড়ি করিতেছে—খাট, চেয়ার, টেবিল, সেটি লইয়া। ঘরের মধ্যেও আসবাব-পত্র নাড়াচাড়া গোছগাছ করার শব্দ। সবার ওপর হিরণ্ময় বাবুর গলা—ঘরের মধ্যেই—হুকুম করিতেছেন, ধমকাইতেছেন, নিজেও ছুটাছুটি টানাটানি করিতেছেন। গেটের মধ্যে পা দিয়াই একচোট থমকিয়া দাঁড়াইলাম, এমন কি হিরণ্ময় বাবুর গলা সত্ত্বেও মনে হইল ভুল-বাড়িতে ঢুকিয়া পড়ি নাই তো! তাহার পর একটু এদিক্-ওদিক দেখিয়া লইয়া সোজা বৈঠকখানায় গিয়া উঠিলাম।

চেনা শক্ত হিরণ্ময় বাবুকে, কাপড়টা মালকোঁচা মারিয়া পরা, গায়ে একটা গেঞ্জি, কাঁধে তোয়ালে, সবগুলাতেই কালিঝুলি পড়িয়া ময়লা হইয়া গেছে, মাথার চুল অবিন্যস্ত। আমায় দেখিয়াই অত্যধিক আনন্দে ধমক দিয়া উঠিলেন—"এই যে, কোথায় ছিলেন মশাই? নিজে একবার গেছি, তার পর তিন তিনবার লোক পাঠিয়েছি—বাবু নেহি আয়া হ্যায়—বাবু নেহি আয়া হ্যায়—বাবু নেহি আয়া হ্যায়—এত রাগ ধরছিল আপনার ওপর।—"

বিমূঢ় ভাবে একবার চারি ধারে চাহিয়া লইয়া প্রশ্ন করিলাম—"ব্যাপারখানা কি বলুন তো,—কার্পেটে—ফার্ণিচারে—ছবিতে একেবারে যে চেনাই যায় না ঘরটাকে!—হঠাৎ—"

"ছোড়দি আসছে যে মশাই! বিকেলের এক্সপ্রেস টেলিগ্রাম—কাল সকালেই আসছে, একলা নয়—ছোড়দি, রমেন—আমাব ভায়রা-ভাই, ওদের বড় মেয়ে মুন্নু, মেজ মেয়ে লিলি, সেজ রমা, দুটি ছেলে বীরু আর হীরু—চিঠি দিলেই পারতো তো?—এ ঠিক ছোড়দির দুষ্টুমি—আমায় একেবারে

সারপ্রাইজ করে দেওয়া—ও যেন বিনা নোটিশেই হুড়মুড় করে এসে পড়েনি এই আমার বাবার ভাগ্যি—তক্ষুণি ছোট্ট শহরে—কোথায় ফার্নিচার পাওয়া যায় ভাড়ায়, কোথায় ডেকোরেশনের সরঞ্জাম—এক চুল এদিক-ওদিক হলে রক্ষে রাখবে ছোড়দি মশাই? অথচ হাতে মাত্র এই রাত্তিরটুকু—"

মুখটা রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, কথা বলার মধ্যেই উৎসাহে মাঝে মাঝে হাসি ফুটিয়া উঠিতেছে মুখে।

প্রয়োজন ছিল না, তবুও বলিলাম—"ভায়রা-ভাইয়ের কথা বলছেন, ছোড়দি তাহ'লে আপনার—"

"শালী মশাই, তনিমার বোন! তনিমা হোল আমার ওয়াইফ, সব চেয়ে ছোট, তার ওপরেই ছোড়দি, তার ওপর—"

আবার, প্রয়োজন না হইলেও ক্ষীণ সন্দেহটুকু মিটাইয়া লইবার জন্যই বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলাম—"তাহ'লে বড়দি হলেন -"

কিছু মাত্র হাসির কথা নয়, তবুও আজকের অন্তরের আনন্দেই হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন হিরণ্ময় বাবু, বলিলেন—"এই দেখো কাণ্ড!—শৈলেন বাবুর আমাদের বড়দি আর ছোড়দির হিসেব রাখতেই মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে? সেই যে বলে 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ে সীতা কার বাপ'—আপনারও হোল তাই মশাই!—ছোড়দি ওয়াইফের বোন বলে বড়দি মেজদি সবাইকে তাই হোতে হবে? বড়দি হোল আমার নিজের দিদি—মাত্র তিন বছরের বড়—বড়দি আসছিল কলকাতা থেকে, আর ছোড়দি আসছে এলাহাবাদ থেকে—আমার শ্বশুরবাড়ি—ছুটিতে এসেছিল, আমি দেওঘরে আছি শুনে দলবল নিয়ে ছুটে আসছে—এসেই তু'দিন থেকে বলবে—চললাম—তা ভেবেছেন না কি দোব ছেড়ে আমি?"

অনেক বিচিত্র জীব দেখা অভ্যাস আছে জীবনে, মনের ভাবটা চাপিয়া বেশ হাসিমুখেই বলিলাম—"আমাকেই এত বেরসিক ঠাওরালেন?—ওয়াইফের বোন, তা কখনও পারে মানুষে ছেড়ে দিতে হাতের মধ্যে পেয়ে? তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তো নিজের বোনের মতন খেলো করে দেওয়া হোল তাকে, বলুন না—মানুষ তো চার-পেয়ে জন্তু নয় মশাই, তার একটা কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না?—এ কি কথা!—"

বীরু আসিয়া উপস্থিত হইল।

চুল উস্কখুস্ক, মুখ আর বস্ত্রের দিকে চাহিয়া মনে হয় বহুদিনই ধোপা-নাপিতের সঙ্গে উহার সাক্ষাৎ নাই। পা-ও খালি। ফিটফাট কোন কালেই থাকে না, তবুও আজ যেন অত্যন্ত বাড়াবাড়ি। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"এ কি, কেউ মারা গেছে নাকি?"

প্রশ্নটা মুখ দিয়া বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝিতে পারিলাম। ভুল হইয়া গিয়াছে,—শোকের বেশ নয়, গায়ে জামা রহিয়াছে। বীরু উত্তর করিল—"কেউ বেঁচে নেই।"

ওর উত্তর এই রকম হেঁয়ালি গোছেরই হয়। কোন পারিবারিক বিয়োগ নয় বলিয়া কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়া হেঁয়ালীর অন্তর্নিহিত অর্থ টা বাহির করিবার চেষ্টা করিলাম একটু। মাথায় আসিল না। বলিলাম, "অনেকদিন পরেই এসেছিস। আমি তোর বাসাতেও গিয়েছিলাম। একবার তো কোন খবরই যোগাড় করতে পারলাম না। দ্বিতীয়বার গিয়ে শুনলাম ও বাসায় আর নেই তুই, কোথায় উঠে গেছিস। তা কোথায় গেছিস?"

"চৌরঙ্গী অঞ্চলে।"

আবার হেঁয়ালি। বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম—"চৌরঙ্গী অঞ্চলে!"

বীরু উত্তর করিল—"কতকগুলো সঙ্গী পেয়ে গেলাম, একসঙ্গে আছি। একটা সিগারেট দে দিকিন, আর এক গ্লাস জল।"

বলিলাম—"কিছু খাবি?—তোর মুখটা বড় যেন শুকনো বোধ হচ্ছে।"

বীরু এক ধরণের কাষ্ঠহাসি হাসিয়া বলিল—"এবার তুই হাসালি। মুখ শুকনো বলেই খেতে হবে! বাঙালী মরতে বসলেও যে তার খাবার দরকার হচ্ছে না। আমায় কি মনে করলি তুই?"

উত্তর যাহা দিলাম সেটা আক্রোশের বশে দিলাম কতকটা। আমি বিদ্যাটাকে বুদ্ধির বলে খাটাইয়া তেতলায় গদি আঁটা কৌচে বসিয়া পাঁচতলার স্বপ্ন দেখিতেছি আর আমার চেয়ে বেশি বিদ্যা থাকা সত্বেও ও বুদ্ধির অভাবে—অর্থাৎ দেশ-দেশ ও জাতি-জাতি করিয়া আজ এই দশায় উপস্থিত। অবশ্য আক্রোশের কারণ এ নয়, কারণটা এই যে, এত নিচে থাকিয়াও ও একেবারেই কিছু না বলিয়াও আমায় যেন নিজের অনেক নিচে করিয়া রাখিয়াছে। কথাটা সত্য করিয়া বলিতে গেলে ও কার নাই, আমি কেমন করিয়া নিজে থেকেই হইয়া গিয়াছি, কিন্তু—

যাক, উত্তর যাহা দিলাম তাহাই বলি। সিগারেট একটা হাতে দিয়া জল গড়াইতে গড়াইতে বলিলাম—"তোকে এ গরীবের বাড়িতে খেতে বলাই ভুল হয়েছে, চৌরঙ্গীর হাওয়া খাচ্ছিস আজকাল তুই।"

কথাটা এখনও বুকে যেন রক্তের দাগে বসিয়া আছে।

বীরু সিগারেটটা ধরাইয়া হেলিয়া পড়িয়া টানিতে টানিতে বলিল—"শুধু খাওয়াই নয়, তোদের পাড়াতেও আসা চলবে না আমার আর। একটা চেঞ্জ হিসেবে আসতাম, তা—"

জল গড়াইতে গড়াইতে ঘুরিয়া প্রশ্ন করিলাম—"অপরাধ?"

বীরুর চেহারাটি মুহূর্তেই যেন কি রকম হইয়া গেল। হঠাৎ সোজা হইয়া বসিয়া উগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"অপরাধ অনেক। এখানে আর ভদ্রলোকের পা মাড়াবার জো নেই। এই গলিতে সাতষট্টিটি বাড়ি পার হয়ে এলাম তোদের এই বাড়িতে, তা এক এক করে গুণে দেখলাম প্রত্যেক বাড়ির দোর গোড়ায় দু'টি-তিনটি, দু'টি-তিনটি, করে দাঁড়িয়ে, দু'বছরের থেকে সত্তর বছরের পর্যন্ত, কারুর কোলে ছ'মাসের

শিশু—দেখলে অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে আসে—হাতে এক একটা করে মাটির বাসন—বড় জোর একটা লোহার শানকি—মুখে এক বুলি—'মা একটু ফেন দাও মা!'—বোঝ, একটা মানুষকে এক থেকে সাতষট্টি পর্যন্ত প্রত্যেক বাড়ির দোর গোড়ায় এই এক হাভাতের বুলি শুনতে শুনতে আসতে হয় তো তার মেজাজের অবস্থা কি রকম হয়? বর্ধমান ডুবেছে কি মেদিনীপুর ডুবেছে, কি নদে খুলনায় ধান নেই তো তোরা সেইখানেই মরগে যা না,—যেন ভদ্দরলোকের পাড়াটাকে একেবারে বস্তিরও অধম করে তুলেছে!—আগে যখন আসতাম তোদের এই গলি—রেডিয়োতে রেডিয়োতে কান ঝালাপালা হোত—ঠিক এই রকম একঘেয়ে, তা যতই কিন্তু মারাত্মক হোক, সে একটা ভদ্র ব্যাপার ছিল তো—আর এ যে—"

আশ্চর্য যে না হইতেছিলাম এমন নয়, তবে সেই সঙ্গে আশ্বস্ত হইলাম। এইবার বাঁচিয়া যাইবে বীরু। চৌরঙ্গী অঞ্চলে উঠিয়াছে, ভাঙিয়া না বলুক, সঙ্গীদের মধ্যে 'কাপ্তেন' গোছের নিশ্চয় কেউ আছে। আর এই বস্তি-বিদ্বেষ, এই ফেন প্রার্থীনীদের উপর আক্রোশ—প্রতি-ক্রিয়া শুরু হইয়াছে, বীরু বাঁচিয়া যাইবে।

চৌরঙ্গী অঞ্চলে গিয়াও কিন্তু চেহারার অবস্থা এমন কেন?—কতদিন হইল গিয়াছে?—যাই হোক এ সমস্যা লইয়া আর মাথা ঘামাইবার দরকার দেখিলাম না। কৌচের হাতলে একটা সিগারেট ঠুকিতে ঠুকিতে বলিলাম—"এইবার তোর সেই বিদকুটে বাইগুলো ছাড়।—আর কি—বয়েস হয়ে এল, এখন নিজের কথাও একটু ভাবতে হবে তো?—না, সেবাধর্ম ভালো, নিন্দে করছি না, তবে নিজেকে বাঁচিয়ে—"

বীরু অন্যমনস্ক ভাবে শুনিতেছিল, হঠাৎ মুখ তুলিয়া বলিল—"নিজেকে বাঁচিয়ে কিছু দিতে পারবি?"

সামান্য একটু চিন্তা করিলাম। মনে মনে হাসিয়া নিজের মনেই বলিলাম, রোগ একদিনে যায় না, চৌরঙ্গীতে বাড়ি লইয়াও আর্তত্রাণ, সেবা, চাঁদা তোলা! উঠিয়া বলিলাম—"দাঁড়া দেখি, কি পারি স্পেয়ার করতে।"

দেরাজ খুলিয়া ওকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইয়া মনিব্যাগটা হাতে করিয়া খুব খানিকটা হিসাব করিলাম, তাহার পর একটা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া লইলাম। দেরাজটা বন্ধ করিয়া ওকে নোটটা দিয়া বলিলাম, "কতকগুলো খরচ আছে ফারনিচারের একটা মোটা বিল পেমেন্ট করতে হবে। আপাতত এই কোন রকমে পারলাম।"

বারান্দার ওদিককার ঘরে টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। বলিলাম, "বোস, একটু দেখে আসি কে।"

কি মনে হইল, সেকেণ্ড কয়েক বাদ, একটি মিথ্যা জুড়িয়া দিলাম—"হয়তো ফারনিচারের বিলটার জন্যে, বড্ড তাগাদা লাগিয়েছে বেটারা।"

এ. ঘোষের ওখানে টি-পার্টিতে ডাকিতেছে। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম বীরু নাই। কাঁচের টপ দেওয়া ছোট টেবিলের উপর অ্যাশ-ট্রে চাপা দেওয়া দশ টাকার নোটটার সঙ্গে একটা ছোট কাগজের টুকরায় পেন্সিলে লেখা—"আগে ফারনিচারের বিলটা শোধ দিয়ে দিস।"

দুইটা দিন চৌরঙ্গীর এমুড়ো ওমুড়ো সাধ্যমত অনুসন্ধান করিলাম—গ্র্যাণ্ড হোটেল পর্যন্ত বাদ দিলাম না। তৃতীয় দিন বীরুর দেখা পাইলাম নিতান্ত অপ্রত্যাশিতভাবে, কার্জন পার্কের উল্টা দিকে, যেখান থেকে বেহালা, মেটিয়াবুরুজ ঐসব জায়গার বাস থামে। বুকে দুইটা হাত জড়াইয়া এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে হোয়াইট অ্যাওয়ের দোকানটির পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে দশবারোটি কঙ্কালসার জীব—মানুষ বলা চলে না তাদের, কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে, কেহ নির্জীবভাবে পড়িয়া, কেহ হাতের পাত্র থেকে বাছিয়া বাছিয়া কি ভক্ষণ করিতেছে। দু'একটি

শিশু আমসির মত স্তন হইতে সান্ত্বনা আহরণের চেষ্টা করিতেছে।— মাঝখানে দাঁড়াইয়া আছে বীরু। আজ গায়ে জামাটা পর্যন্ত নাই। ওর কাছে কেহ ভিক্ষা চাহিতেছে না, বেশ বোঝা যায় সর্বস্ব দিয়া ও এখন ওদেরই একজন। একটু কুণ্ঠা যে না হইল এমন নয়, তাহার পর কাছে গিয়া ডাকিলাম—'বীরু!'

বীরু ধীরে ধীরে মুখটা ঘুরাইয়া আমার পানে চাহিল। দৃষ্টিটা শান্ত কিন্তু উদ্‌ভ্রান্ত। চাহিয়া রহিল, কিন্তু কোন উত্তর দিল না। আরও কাছে সরিয়া গেলাম, প্রশ্ন করিলাম, "একি ব্যাপার? তুই এখানে?"

বীরু প্রতিপ্রশ্ন করিল—"চৌরঙ্গী নয় এটা?"

বলিলাম—"বাড়ি চল, পাগলামি করে না।"

বীরু নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাগ দেখাইতে হইল, বলিলাম —"এই তোর সেবা হচ্ছে? তুই নিজে ওদের সামিল হয়ে গেলে কি করে সেবা করবি? আজ ক'দিন ধরে আছিস এখানে তুই? তোর পাগলামির কি একটা সীমা থাকতে নেই? বাড়ি চল, আর আমিও তোর সঙ্গে কাজে নামছি, দেখি কতটা কি করতে পারি। লোকেদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে—"

বীরুর দৃষ্টিটা আরও উগ্র হইয়া উঠিল, বলিল,—"লোক সব মরেছে। —সব মরেছে একধার থেকে—সামনে হাত পেতে দাঁড়াবার যুগ্যি আর নেই লোক—তুই ঘুরবি বলছিস—আমি ঘুরে ঘুরে হয়রান হয়ে…"

আমায় কয়েকজন ঘিরিয়া ফেলিয়াছে—"একটি পয়সা দাও, ছ'দিন থেকে কিছু খাইনি—বাবু, দেখ ছেলেটার পানে চেয়ে, একটা গেছে—নড়ে আর চাইতে পারি না বাবু—"

একটু দূরে একটা দশ-বারো বছরের মেয়ের উপর দৃষ্টি পড়িল, একখানি কৃষ্ণ-কঙ্কাল। কাহারও অপেক্ষা তাহার অভাবটা কম নয়—

কিন্তু পূর্ণ উলঙ্গতার এত কাছাকাছি যে, সামনে আসিয়া হাত পাতিতে পারিতেছে না।

হঠাৎ একটা কর্কশ চীৎকারে ফিরিয়া চাহিলাম, বীরুর গলা। কোটরগত চোখ দুইটি যেন ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে, শীর্ণ হাতটি বাড়াইয়া চেঁচাইতেছে—"সর, সরে যা সব, নৈলে এবার আমি খুন করব! —তোদের জ্বালায় লোক ফার্নিচার কিনে তার বিল শোধ করতে পারবে না?—সর্ সর্ সরে যা সব—আমি আর সামলাতে পারব না নিজেকে বলে দিচ্ছি—সর্!"

আসিয়াই এক এক করিয়া চেয়ার টেবিল সব বিক্রয় করিয়া দিলাম। টাকা হাতে ছিল, কিন্তু মনে হইল সে টাকা বীরুকে বাঁচাইবার জন্য যথেষ্ট নয়। একবার মনে হইল টাকা লইয়াই যাই কিন্তু কেমন যেন সন্দেহ হইল তাহাতে ওকে ফেরান যাইবে না। চোরাবাজার হইতে দুই বোরা চাল, দুই বোরা ডাল সংগ্রহ করিয়া একটা ঠেলাগাড়ি ভাড়া করিয়া চৌরঙ্গীর দিকে যাত্রা করিলাম, বীরু আসে ভাল, নয়তো ইচ্ছামত সেখানে যদি সে সেবাকেন্দ্র খুলিতে চায় খুলুক।

বিক্রয় আর খরিদে সমস্ত দিনটা গিয়াছে, কাগজ পড়িবার ফুরসুৎ পাই নাই। চৌরঙ্গীর মোড়ে আসিতেই একটা ছোঁড়া একতাড়া কাগজ হাতে করিয়া সামনে দাঁড়াইল—"অ্যালাইজ্ র‍া ইটালীতে নামল বাবু—"

একটা কাগজ কিনিলাম। প্রথমেই চক্ষু গিয়া পড়িল—কলিকাতার মৃত্যু সংখ্যা স্তম্ভের উপর। দৃষ্টিটা সেইখানে আটকাইয়া গেল।—কোন হাসপাতালে কতজন অনাহার-রুগ্ন ভর্তি হইল, কতজন মরিল। কোন রাস্তায় কত মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে তাহার হিসাব দিয়া লেখা আছে—চৌরঙ্গীর সামনে তিন। একজন ভদ্র-সন্তান বলিয়া অনুমিত, বয়স অনুমান সাতাশ বৎসর।

ঠেলাগাড়ি ফিরাইয়া যখন বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম, কন্যা আসিয়া হাতে একটি খাম দিল, বলিল—"তুমি যখন চাল কিনতে গিয়েছিলে সেই সময় আসে।"

বেয়ারিং খাম। পেন্সিলে ঠিকানা লেখা। হস্তাক্ষর চেনা, তাড়াতাড়ি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। বীরুই লিখিয়া গিয়াছে—

"দুঃখ করিস নি, বোধ হয় তোর প্রতি অন্যায় করে গেলাম। একটা কথা বুঝতে পারলাম না, তাই মহাযাত্রীদের দলে ঢুকে পড়লাম - আমাদের বাঁচবার অধিকার রয়েছে অথচ উচ্ছিষ্ট দানের আশায় দিনানুদিন চেয়ে থাকি কেন?"

একটা কথা মাথায় ক্রমাগতই চক্র দিয়া ঘুরিতে লাগিল—উচ্ছিষ্ট দান—উচ্ছিষ্ট দান—উচ্ছিষ্ট—সমস্ত দেশটায় একমাত্র ওরই এই কথা বলিবার অধিকার ছিল।

চিন্তার মধ্যেই একটা সন্দেহ জাগিল। কিন্তু যাহারা প্রতিদিন এই দান লইয়া বাঁচিয়া রহিয়াছে তাহারা তো একে উচ্ছিষ্ট বলে না।—নিজের কাছেই উত্তর পাইলাম—"তাহাদের মুখে ভাষা নাই, থাকিলে তাহারাও ঠিক এই কথাই বলিত। যত মানুষ গেল আর যত যাইবে—সবার মনুষ্যত্বের প্রতিভূ হইয়া বীরেশ এই প্রশ্ন রাখিয়া গিয়াছে।"

প্রথম আলাপের ভঙ্গিতেই ভদ্রলোককে একটু খাপছাড়া বলিয়া মনে হইয়াছিল, তারপর মাঝখানে আবার যেন—কিন্তু কাহিনীটাই আগাগোড়া বলিয়াই যাই।

আমার গাড়ির সামনে আসিয়া ভিতরটা একবার দেখিয়া লইয়া পিছন দিকে চাহিয়া হাঁক দিলেন—"ওগো, এইটেতেই এস, একটু ফাঁকা আছে।"

একটি ভদ্রমহিলা আসিয়া উপস্থিত হইলেন,চওড়া লালপেড়ে শাড়ী-পরা, সিঁথিতে চওড়া করিয়া সিঁদুর টানা, গায়ে হাতে ভারি ভারি গোটাকতক গয়না, পায়ে স্যাণ্ডেল, ডান হাতে একটা তালপাতার জালি ব্যাগ। দু'জনেরই বেশভূষায় সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়াই মনে হইল, তবে একটু যেন পাড়াগেঁয়ে ভাব আছে, বিশেষ করিয়া মহিলাটির। দুইজনে উঠিয়া আমার বেঞ্চটিতে উপবেশন করিলেন—ভদ্রমহিলা কোণের দিকে একটু জড়োসড়ো হইয়াই।

ভদ্রলোক আলাপ শুরু করিলেন,হাসিয়া একটু নিম্নস্বরে বলিলেন—"দিব্যি গান শুনছেন দেখছি, বাঃ, এ যে গন্ধর্বপুরী একেবারে!"

আমিও হাসিয়া উত্তর করিলাম—"আপনিও তো লোভ সামলাতে পারলেন না। আশা করেছিলাম এ আসরে আর কেউ এসে ভিড় জমাতে চাইবে না, দাঁতে দাঁত চেপে কোন রকমে বসে থাকতে পারলে অন্তত একটু হাত পা ছড়িয়ে যেতে পারব।"

সেকেণ্ড ক্লাসের এদিককার বেঞ্চে আমরা তিনজন, ওদিককার বেঞ্চটায় কিন্তু একটুও জায়গা নাই, একজন মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আর

পাঁচজন মাড়োয়ারী মহিলা কতকটা গাদাগাদি হইয়াই বসিয়া আছে, ভদ্রলোকটি সামান্য একটু ব্যবধানে। তাহার মাথায় রাঙা টকটকে

সিল্কের পাগড়ি, গায়ে একটি ভালো সিল্কের লম্বা কোট, তাহার বোতাম-গুলো সব সোনার, দুই হাতেই গোটাচারেক হীরা আর পান্নার আংটি, জামার ওপর একটা সিল্কের চাদর জড়ানো, চোখে কাজল। বয়স মনে

হইলে চল্লিশের দু'এক বছর ওপরেই হইবে। মহিলা কয়জনের দেখা যায় শুধু পায়ের গোছে মোটা মোটা মল, জরিদার দিল্লী নাগ্‌রা, আর মণিবন্ধে মোটা মোটা সোনার চুড়ি। বাকি সমস্তই সুপরিসর রঙিন ছাপা চাদরে ঢাকা, তাহারই ঘোমটা এদিকে উদর পর্যন্ত নামিয়া আসিয়াছে। পাঁচজনেই বেশ সপ্রতিভ কণ্ঠে একটা গান ধরিয়াছে। পুরুষটি একধারে একটু জড়োসড়ো হইয়া বসিয়া আছে, এবং এক-আধবার যেমন চঞ্চলভাবে আমাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে তাহাতে মনে হয় সে নিজে বেশ সপ্রতিভ নয়। তাহার চোখের কাজল এবং দৃষ্টির এই জড়তা দেখিয়া মনে হইল সমস্ত অভিযানটির বিবাহ-গত কোন ব্যাপারের সঙ্গে সম্বন্ধ আছে এবং সঙ্গীতটি আনুষ্ঠানিক।

আর একটা কথা, সকলেই একটু বেশ স্থূল! এমন কিছু উল্লেখ করিবার কথা নয়, তবে ওদের হিসাবেও সবার স্থূলতা একটু বেশি তাই বলিয়া রাখিলাম। নিশ্চয় সাধারণ ধনী মাড়োয়ারীর অনুপাতেও অর্থসাচ্ছল্য খুব বেশি।

সঙ্গীত লইয়া রহস্যটুকুর পর আমাদের অন্যান্য কথাবার্তাও হইল। নবাগত ভদ্রলোকের নাম রাধাকান্ত আচার্য। রাজসাহী জেলায় বাড়ি। কিছু জমিদারি আছে, কিন্তু পাকিস্তানে পড়িয়া গেছে, বিস্তর অসুবিধা, তাই এদিকে একটু আস্তানা দেখিতে আসিয়াছিলেন স্ত্রী-পুরুষে, এখানে একজন আত্মীয় উকিল আছেন তাঁহারই বাড়িতে থাকিয়া। জায়গা একটা পাওয়া গেছে। এইবার ওদিকে একটা ব্যবস্থা করিয়া ফিরিয়া আসিবেন পরিবারবর্গ সমেত।

আমার পরিচয়াদি লইলেন। ইতিমধ্যে গাড়িটা ছাড়িয়া দিয়াছে। গোটাচার স্টেশনের পরেই পূর্ব-বঙ্গের সীমানা, আমাদের গল্প-গুজবের মধ্যে একটা স্টেশন পারও হইয়া গেল।

কতটা গায়ে পড়া হইলেও বেশ আমুদে লোক। একটু বোধ হয়

বেশি গল্প করার অভ্যাস আছে, প্রশ্ন করিয়া করিয়া একটু বেশি বকাইবারও, কিন্তু সরস মন্তব্য দিয়া গল্প বলারও, আর শোনারও এমন একটি ক্ষমতা আছে যে বিরক্তি তো আসিতে পারে না, বরং সময়টা যে কোথা দিয়া কাটিয়া গেল যেন বুঝিতেই পারা গেল না।

দ্বিতীয় স্টেশন পার হইয়া গেল, রাধাকান্তবাবু বেশ গলা নামাইয়া বলিলেন—"এবার ওদিকে একটু রগড় করা যাক্ মশাই, দিব্যি ফুটফুটে বরটি, লোভ সামলাতে পারা যাচ্ছে না।"

বলিলাম—"করবেন কি আলাপ উনি ? বড্ড লাজুক মনে হচ্ছে।"

"বর লাজুক হবে না ? কী যে বলেন! তায় অমন ছেলে-মানুষটি—"

একটু সরিয়া আসিয়া কতকটা সামনাসামনি হইয়া প্রশ্ন করিলেন—"কোথায় যাওয়া হবে আপনাদের !"

যেমন আশঙ্কা করিয়াছিলাম, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটি এই গায়ে পড়িয়া আলাপ-করাটা বেশ যেন পছন্দ করিল না, একটু গম্ভীরভাবেই বলিল—"আমনোড়া।"

"আসছেন কোথা থেকে ?"

"মালদহ"—মুখটা আর একটু গম্ভীর হইল।

"আমনোড়া কি করতে যাচ্ছেন ? বিয়ে করতে নয় তো ?"

ভদ্রলোক একটু নিরুত্তরই রহিল, তাহার পর গোঁফ জোড়াটা ফুলাইয়া একটু আড়ে চাহিয়া বলিল—"এত জানবার কি দরকার আছে আপনার মোশাই ? ঠাট্টা কোরবারই বা কি হক্ আছে ?"

ব্যাপারটা আমার কাছেও বড় বিসদৃশ বলিয়া বোধ হইল, যেন কাঠ রসিকতা গোছের। রাধাকান্তবাবু কিন্তু দমিলেন না, একটু হাসিয়াই বলিলেন—"সে কি কথা! আপনি হিন্দুস্থান থেকে পাকিস্তানে যাচ্ছেন বিয়ে করতে, অর্থাৎ আমার দেশে, ঠাট্টা করবার সম্বন্ধ হল না ?—

কিন্তু কনে কি তারা সেখান থেকে আনতে দেবে ? একটা ছুঁচ আনতে গেলে রুখে দাঁড়াচ্ছে যে। তায় বরযাত্রী তো মাত্র পাঁচজন মেয়ে, তাঁরা উড়্‌নি সামলাবেন কি—"

ঠাট্টাটা একেবারে অভদ্রতায় গিয়ে দাঁড়ায়। ভদ্রলোকের চরিত্রে সামঞ্জস্য-বোধের একটা অভাবে আর তাহার হঠাৎ পরিচয়ে আমিও যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেছি, একটু শুষ্ক কণ্ঠেই বলিলাম—"থাক, উনি কোথায় যাচ্ছেন তাতে আমাদের কি ?"

রাধাকান্তবাবু এবার আমার দিকে মুখ ঘুরাইলেন, বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন—"আপনি অবাক করলেন মশাই ! উভয় পক্ষেই সমান দরকার যে। ওঁরও পুরুষ বরযাত্রী নিতান্ত দরকার—পাকিস্তান থেকে মেয়ে আনতে যাচ্ছেন, আমাদেরও ফাঁকতালে ছুটো দিনের চব্যচুষ্যের ভালরকম ব্যবস্থা হয়। আপনি তো হিন্দুস্থানেরই মানুষ, হক্‌ আছে, আমিও পড়ি ঢুকে। র‍্যাশনের বাজারে কতদিন লুচি-হালুয়া-রাবড়ির মুখই দেখি নি !"

ভদ্রলোকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কি মশাই, অন্যায় বলছি ?"

সে এবার বেশ স্পষ্ট বিরক্তিতেই মুখটা ঘুরাইয়া লইল।

গাড়ির হাওয়াটা হঠাৎ গুমোট হইয়া উঠিয়াছে, সঙ্গীত থামিয়া না গেলেও বেশ একটু স্তিমিত হইয়া আসিয়াছে, ঘোমটা ঢাকা মুখগুলো রাধাকান্তবাবুর দিকে মাঝে মাঝে উত্তোলিত হইয়া নিশ্চল হইয়া যাইতেছে, দেখা না গেলেও তাহাদের ভাবগুলা যে প্রীতির নয় এটা বেশ অনুমান করা যায়। রাধকান্তবাবু নির্বিকার, ঠোঁটে একটু হাসি লইয়া নূতন রসিকতার কথা চিন্তা করিতেছেন। ওদিকে তাঁহার সঙ্গিনী ভদ্রমহিলা জানলা দিয়া মুখটা বাহিরে বাড়াইয়া দিয়াছেন তাঁহার ভাবটা বোঝা যাইতেছে না।

একটু চুপচাপ গেল, সঙ্গীর আবার আগেকার পর্দায় ফিরিয়া আসিল

ভদ্রলোকের মুখটাও একটু নরম হইয়া আসিয়াছে, রাধাকান্তবাবু প্রশ্ন করিলেন—"রাগ করলেন নাকি? উত্তর দিচ্ছেন না যে?"

বোধ হয় একটু মোলায়েম করিয়া বলার জন্যই এবার ভদ্রলোক একটু নরম হইলেন, ব্যাপারটা পরিষ্কার করিয়া জানাইয়া দিলে যদি নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এইভাবে বলিলেন—"বিয়ে নয় মোশাই, আমনোড়ায় আমাদের কারবার আছে, ঠাকুরবাড়ি আছে, দ্বিরাগমনের পর ঠাকুরবাড়িতে আমাদের বিধ্ করতে হোয়, তাই যাচ্ছি। এই রোকোম করে গীত গেয়ে যেতে হয়।—এবার বুঝলেন আপনি? খুশ্ হোলেন?"

রাধাকান্তবাবু একটু সন্তোষের হাসি মুখে টানিয়া বলিলেন—"ও, তাই বলুন। অথচ এই সামান্য কথাটা না বলে আপনি রাগ করছিলেন। এক সঙ্গে যাচ্ছি, জানবার কি ইচ্ছে হয় না? আচ্ছা, তা'হলে আর একটা কথা—কনেও ওঁদের মধ্যে আছেন? গান করছেন?"

প্রশ্নটা এতই রূঢ় যে আমাকেও যেন আপনা হইতেই সোজা হইয়া বসিতে হইল, বেশ একটি অনুযোগের কণ্ঠে বলিলাম—"ছিঃ, এ কি করছেন রাধাকান্তবাবু?"

ভদ্রলোক তো ওদিকে একেবারে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছে—"এ কি রোকোম বেয়াদপি আছে!"—বলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে যাইতেছিল, রাধাকান্তবাবু সেইরকম নির্বিকার ভাবেই একটু হাসিয়া, হাত উঁচাইয়া বলিলেন—"থামুন, রেগে তেড়েফুঁড়ে দাঁড়িয়ে উঠবেন না।"

ভদ্রলোক মনে হইল স্থূলত্বের জন্যই আর উঠিল না, তবে বসিয়া পড়িয়া গর্জাইতে লাগিল, "আপনি ওপোমান কোরবার কে আছেন মোশাই? মেয়েদের টেনে কথা বলবার কে আছেন? পাকিস্তানের লোক আছেন, তো আগে পাকিস্তানে চলুন, এখানে আপনার কি

একতিয়ার আছে যে মেয়েদেব ধরে কথা বোলেন ? ইয়াদ রাখবেন এটা হিন্দুস্থান আছে, এখানে—"

গীত একেবাবে থামিয়া গেছে, রাধাকান্তবাবু একটু আড়ে চাহিয়া লইয়া বলিলেন—"এ কি, ওঁরা গান থামালেন কেন ? দিব্যি শুনছিলাম ! কামিনী কণ্ঠের গীত !—"

"হুঁসিয়ার থাকবেন মোশাই !"—বলিয়া ভদ্রলোক গর্জন করিয়া উঠিল, কিন্তু এবার জায়গা ছাড়িয়া উঠিবার একেবারেই চেষ্টা করিল না। শুধু তাহাই নয়, বিস্মিত হইয়া লক্ষ্য করিলাম, কণ্ঠে বজ্র থাকিলেও চোখে কিন্তু সে বিদ্যুৎ নাই এবারে। রাধাকান্তবাবুর দিকে যে-দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে, তাহাতে যেন একটা প্রশ্ন আর আশঙ্কাব ভাবই জড়িত।

একটু বিস্ময়ের পর আমারও হঠাৎ খেয়াল হইল, পাগল নয় তো রাধাকান্তবাবু !—নিশ্চয় উদম পাগল নয়, আমার সঙ্গে যেমন নিতান্ত সহজভাবে কথা কহিলেন, বরং তাহাতে বুদ্ধির দীপ্তিই ছিল। কিন্তু এমন পাগল তো আছে, অবস্থা বিশেষের মধ্যে যাহাদের পাগলামি হঠাৎ চাগাইয়া ওঠে।—তাহা না হইলে এই অভাবনীয ব্যাপাব, একেবারে ভদ্রমহিলাদের লইয়া ঠাট্টা, তাহাও একেবারে এবকম বেপর্দাভাবে !

ওদিকে বাধাকান্তবাবু তর্জনের উত্তরে বেশ মোলাযেম হাসি হাসিয়া বলিয়া চলিয়াছেন—"আপনি বাগছেন কেন অত ? নিজেই বলছেন বিয়ের পর ঠাকুর বাড়িতে একটা কি বিধি-অনুষ্ঠান হয় সেইটে সারতে যাচ্ছেন, তাতে যে নতুন কনেকে বাদ দিয়ে যাবেন, কি করে জানব বলুন না। আমার তো এখনও বিশ্বাস তিনি আছেন এর মধ্যে। এক সঙ্গে যাচ্ছি, বরং আপনার দেখিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। দিন না দয়া করে—"

আমার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি মশাই, ইচ্ছে করে না দেখতে ? আর, তাতে দোষ আছে কিছু ?"

আমি নিঃসন্দেহ হইয়া উঠিয়াছি। প্রতি কথাতেই পাগলামির লক্ষণ যতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির মুখ ততই শুকাইয়া উঠিতেছে, ভেতরে ভেতরে যেন অতিরিক্ত নার্ভাস হইয়া উঠিয়াছে, এমন কি প্রায় গালাগালের কাছাকাছি এইরকম কটূ উক্তিতে এবার একটা কথা পর্যন্ত বলিল না। আমার মুখের পানেও যে চাহিতেছে তাহাতে বেশ একটা অসহায় কাতরতার ভাব আছে, যেন বিপদে সাহায্য চায়। আমিও তৈয়ার হইয়া উঠিয়াছি, পাগল তো তাহাকে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। তাহার পূর্বে একটা কথা মনে উদয় হইল, আর দ্বিধা না করিয়া গলা বাড়াইয়া ভদ্রমহিলার দিকে চাহিয়া বলিলাম—"দেখুন, আর ওরকম নিশ্চিন্দি হয়ে বসে থাকা চলে না। এঁর মাথার কি কোনও রকম গোলমাল আছে?—তা'হলে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করুন, শুনছেন তো?—ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে—"

আশ্চর্য! কোন উত্তর নাই। শুধু মুখটা আরও একটু বাহিরে বাড়াইয়া দিলেন। সেটাও না হয় বোঝা যায়, ভদ্রমহিলা যেরকম আধা-পাড়াগেঁয়ে লজ্জাশীল প্রকৃতির, কিন্তু আমার কথায় শরীরটা যে-রকম দুলিয়া দুলিয়া উঠিতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল, হাসি যেন আর চাপিতে পারিতেছেন না—একি, স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই পাগল নাকি! যেটাকে পাড়াগেঁয়ে জড়তা মনে করিয়াছিলাম সেটা তাহারই চাপা লক্ষণ নয় তো?

একটা একেবারে নূতন রকম সমস্যায় পড়িয়া আমি যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। ভদ্রলোকটির অবস্থাও সেই রকম, শুধু একবার নিতান্ত বিরক্তির সঙ্গে মুখ বেঁকাইয়া, কতকটা যেন সবার সাহসটা বজায় রাখিবার জন্যই নিজেদের ভাষায় বলিল—"আরে তে থমো কেঁও, গীত গায়ে চল্লো না—"

গান আবার চালু হইতে রাধাকান্তবাবু বলিলেন—"এই দেখুন তো,

কেমন কান যেন জুড়িয়ে দিলেন, এইবার —যখন দয়া করে এ অনুরোধটি রাখলেন—কনেটিকেও একবার ঘোমটা তুলে দেখিয়ে দিন—"

ধৈর্য রাখা গেল না, এবার আমিই প্রায় ধমক দিয়াই উঠিলাম—"রাধাকান্তবাবু, চুপ করতে হবে, সত্যিই অসহ্য করে তুলেছেন আপনি, এ কি! ভদ্রমহিলাদের নিয়ে—"

ব্যাপারটা দ্রুত একেবারে চূড়ান্তে আসিয়া পড়িতেছে। রাধাকান্তবাবু আমার কথায় একেবারেই কান না দিয়া ভদ্রলোকের পানে চাহিয়া বলিলেন—"আচ্ছা, আপনার বিধি-অনুষ্ঠানের আগে কনেকে ছুঁতে বাধা থাকে, আমিই না হয়—"

—কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই উঠিতে যাইতেছিলেন, আমি একেবারেই বজ্র আঁটুনিতে ডান হাতটা চাপিয়া ধরিয়া হুঙ্কার করিয়া উঠিলাম—"বসুন বলছি, গালাগালির ওষুধ আমার ভালো রকম জানা আছে!"

মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকেও ধমক দিয়া উঠিলাম—"কি রকম অপদার্থ গাড়ল আপনি মশাই, পাঁচজন বাড়ির মেয়েকে নিয়ে এসেছেন, অথচ একটা পাগলকে ঠেকাবার সামর্থ নেই! ভয়ে কাঠ হয়ে বসে আছেন—"

একেবারে যেন পাথরের মূর্তি, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সামনে চাহিয়া বসিয়া আছে।—ভদ্রমহিলা ওদিকে চাপা-হাসি হাসিয়া খুন হইতেছেন।

রাধাকান্তবাবু আমার দিকে চাহিলেন, ঠোঁটে সেই রকম মিটিমিটি হাসি লইয়া, পাগলের অবুঝ দৃষ্টিতেই চাহিয়া বলিলেন—"হঠাৎ আপনার এত আপত্তি কেন?"

তাহার পর মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটিকেই সাক্ষী মানিয়া তাঁহার পানে চাহিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ মশাই, আমি তো গায়েও হাত দিতে চাই নি, শুধু ঘোমটার কাপড়টা—"

আমি এমন একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিয়া আমার দিকে ঘুরাইয়া লইলাম যে ভদ্রমহিলা পর্যন্ত কতকটা ভীত হইয়া ঘুরিয়া বসিলেন। বলিলাম—

"তারও ওষুধ আছে—মেয়েদের কাপড়ে হাত দেবার। আর এক পা এগিয়েছ কি তোমার দুঃশাসনের অবস্থা করে দেব। হতভাগা কোথাকার!"

এবার পাগলের এমন একটা লক্ষণ প্রকাশ পাইল যে ক্ষণিক ভয়ে আমার হাতের মুঠাটাও একটু যেন শিথিল হইয়া গেল। রাধাকান্তবাবু স্থিরভাবে আমার মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন, সেই মৃদু হাসিটা আস্তে আস্তে বিস্তারিত হইয়া উঠিল, তাহার পর হো হো করিয়া একেবারে বদ্ধ পাগলের মতোই উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিলেন, একটু পরে দম লইয়া হাসির মধ্যেই বলিলেন —"আসল মজার কথাটা আপনিই বললেন মশাই—ওঃ—দুঃশাসন!—দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ!—কি শেঠজি? যাচ্ছে না ঠিক মিলে?—"

ও-পর্ব ঐখানেই শেষ হইল, তাহার পর কুরুসভার দৃশ্যটিই হইল অভিনীত, ভূমিকায় একটি দ্রৌপদী নয়, একেবারে ছয়টি।

গাড়ির গতি নরম হইয়া আসিল, রাধাকান্তবাবু পকেট থেকে একটি পরিচয়-কার্ড বাহির করিয়া আমার সামনে ধরিতে আমার হাতটা শিথিল হইয়া গেল, "মাপ করবেন, আগে বলা উচিত ছিল"—বলিয়া ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িলাম, যে-বিভাগের অফিসার সে-হিসাবে একটু বোধ হয় বেশি কৌতুকপ্রিয় তবে রঙ্গ-অভিনয়ের মধ্য দিয়াও ব্যাপারটা পরিষ্কার হইয়া আসিতে লাগিল আমার কাছে।

সঙ্গিনী ভদ্রমহিলাকে বলিলেন—"এবার খোলাটা দিন।"

ধীরে ধীরে নিজের পরিচয়ের পোশাকটা পরিলেন। ভদ্রমহিলাও দেখিলাম আর সেই ব্রীড়াময়ী আধা-পাড়াগেঁয়ে জমিদার-গৃহিণীটি নেই।

এবার রাধাকান্তবাবু মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন —"আর বুঝতেই তো পাচ্ছেন, এবার আপনার সঙ্গিনীদের এক এক করে বাথরুমে ঢুকতে বলুন। ভয় নেই, আমি গায়ে হাত দেব না, আমার ঐ সঙ্গিনীই যা করবার করবেন।"

আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"দুঃশাসন হবার আর কার সাধ থাকে, বিশেষ করে এই কাঠামোর দ্রৌপদীদের নিয়ে?"

সবই ঠিক করা ছিল, গাড়ি থামিতে রাধাকান্তবাবুর অধীনেরই চার জন সশস্ত্র পুলিশ আসিয়া গাড়ির দুইটা দরজায় দাঁড়াইল, বাহিরে ভিড় জমিয়া উঠিতে লাগিল।

তবে বাথরুমে শেষ পর্যন্ত রাধাকান্তবাবুকেই প্রবেশ করিতে হইল। তাহার সঙ্গিনী একজনকে লইয়া প্রবেশ করিবার আধ মিনিটটাক পরেই ত্রস্তভাবে বাহির হইয়া আসিলেন, চোখ বড় বড় করিয়া বলিলেন—"আপনাকেই আসতে হবে—মেয়ে নয়!"

"অ্যাঁ! বলেন কি!"—রাধাকান্তবাবু শিহরিয়া উঠিলেন, মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির পানে চাহিয়া বলিলেন—"ঠাট্টায় শেষ পর্যন্ত আপনারই জিৎ রইল শেঠজি!"

অদ্ভুত! এক একজনের গায়ে দশখানা বারোখানা করিয়া ধুতি, শাড়ী, জামার কাপড়! এ ধরণের ভেল্কি জীবনে দেখি নাই, একে একে যখন একবস্ত্রে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল, শুকাইয়া একেবারে চুপসাইয়া গেছে, যেন কতদিনের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত রোগী!

আর, সবাই মাড়োয়ারীও নয়, দুজন বাঙ্গালী, একজন মনে হইল উৎকলী, এত বিপদেও পান চিবাইতেছে। আর তিনজন মাড়োয়ারী বলিয়াই বোধ হইল, দলপতিকে লইয়া। তাহার নিজের শরীর থেকে বাহির হইল দু'খানা সিল্কের শাড়ী, একখানা চাদর, বাকী সব কটা কাপড়—তিনটে ফতুয়া, একখানা শার্ট, আর তিনখানা কোট।

দলবল লইয়া নামিয়া যাইবার সময় রাধাকান্তবাবু নমস্কার করিয়া বলিলেন—"বড় একঘেয়ে কাজ, একটু ফষ্টি-নষ্টি না নিয়ে থাকলে চলে না, মাফ করবেন।"

সকাল বেলা। গঙ্গাধর রাস্তার ধারের বারান্দাটিতে একটা আরাম কেদারায় বসিয়া গড়গড়া টানিতেছেন। কিশোর-কিশোরীদের একটা বেশ মাঝারি সাইজের মিছিল এইমাত্র গান করিতে করিতে চলিয়া গেল। সবার হাতে একটা করিয়া ছোট জাতীয় পতাকা, মুখে উৎসাহ, তাহার ওপর সূর্যের আলো আসিয়া পড়িয়াছে। নবীনের ছেলে প্রশান্ত সব আগে, গঙ্গাধরকে দেখিয়া বলিল—"দাদু, আজ স্বাধীনতা-দিবস!" তাহার পর তাহারই পরিচালনায় সমস্ত দলটা বলিয়া উঠিল—"গঙ্গাধর দাদুকী—জয়!!" গঙ্গাধর হাসিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গান করিতে করিতে দলটা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হইয়া গেল।

মনে পড়িয়া গেল কিঞ্চিদধিক চল্লিশ বৎসর আগেকার কথা। এই রাস্তা ধরিয়া তাঁহারাও এইরকম গান করিতে করিতে যাইতেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল সতের-আঠার বৎসর। এদের জয়োল্লাসে সেই দিনের উন্মাদনা জীর্ণ ধমনীতে আবার যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। তাঁদের ছিল সাধনা, এদের হাতে সিদ্ধি।

আজকাল কিন্তু কোন উন্মাদনাই টেঁকে না বেশিক্ষণ, যত বড়ই তাহার সূচনা হোক না কেন, যত বড়ই প্রেরণা। কোন একটা প্রশ্নের সূত্র ধরিয়া স্তিমিত হইয়া আসে, তাহার পর বিরক্তি, তাহার পর তিক্ততা, অবসাদ, হতাশা—

গঙ্গাধর ভাবিতেছিলেন—সিদ্ধি তো করতলগত; কিন্তু কি সিদ্ধির রূপ! এর জন্যই কি ছিল তাঁহাদের সেই মৃত্যু-পণ সাধনা?—অন্ন নাই, বস্ত্র নাই, রোগে ঔষধ নাই, তাহাও যে অভাবে নাই এমন নয়, থাকিতেও

নাই, অর্থপিশাচদের লালসা দিনদিনই বাড়িয়া মানুষকে তাহার ন্যায্য-প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করিতেছে। প্রতিকার নাই, কে করিবে? যাহাদের হাতে শাসন তাহাদের টিকি ঐ পিশাচদের মুঠোর মধ্যে, মাঝে মাঝে এক একটি ফাঁকা হুঙ্কারে ঠাট বজায় রাখে—তাহাতে প্রজারা হয় ক্ষণিকের জন্য আশ্বস্ত, ওদিকে পিশাচেরা হাসে, কেননা এটা ওদের উভয়ের মধ্যে একটা চুপি চুপি বন্দোবস্ত।—এদিকে দ্বেষা-দ্বেষি, হানা-হানি—নিজেদের মধ্যে, আবার প্রদেশে-প্রদেশে। গালাগালি, ইতরোমির ফুলঝুরি। তারপর কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ—এরা যে মাকে খণ্ডিত করিল, এ যেন তাঁহার দুই-চক্ষের জ্বালা, অভিশাপ হইয়া সন্তানদের ওপর আসিয়া পড়িতেছে।

কিশোরদের জয়োল্লাস দূরে রাস্তায় কোন্ বাঁক থেকে ভাসিয়া আসিতেছে—"ভারত মাতা কি জয়!!" কেমন যেন বিদ্রূপের মতো কানে আসিয়া বাজিতেছে, মনটা এর মধ্যেই এতখানি গেছে বিষাইয়া।

এই সময় ডাক-হরকরা আসিয়া খান তিনেক চিঠি আর দৈনিক কাগজ দুইখানা দিয়া গেল। চিঠি তিনখানা পড়িলেন, একখানা পুত্র প্রমথর, শিয়ালদহে পূর্ববঙ্গের পলাতকদের দুরবস্থার কথা লিখিয়াছে। কেনই বা যে লেখে এ সব!—কাগজ দুইখানা খুলিতে না হয় সাহস, না হয় প্রবৃত্তি। আগাগোড়া যেন অশ্রুর মসী দিয়া ছাপা। তবু পড়িতে হয়, বাহিরের জগতের সঙ্গে ঐটুকুমাত্র যোগসূত্র। রেলে, ষ্টিমারে, নৌকায় দুই দিনের পুরানো খবর লইয়া আসে, এই দুই দিনের মধ্যে ওদিকে আরও কত অশ্রু গড়াইয়াছে কে জানে?

একবার চোখ বুলাইয়া গেলেন একখানা কাগজের ওপর—পাকিস্তানীরা ভালোভাবেই ঢুকিয়া পড়িয়াছে কাশ্মীরে বড় ক্যালিবারের কামান লইয়া—রাজাকারেরা পণ করিয়াছে আর হিন্দু বলিয়া কিছু থাকিতে দিবে না—দুইটা সংবাদ খোঁজা একটা যেন বাতিকে দাঁড়াইয়া

গেছে গঙ্গাধরের। একটা অনেকদিন আগের পুরানো খবরের জের—মন্ত্রীর দল হানা দিয়া কোন মাড়োয়ারীর ময়দার কলে তেঁতুলের বিচির পাহাড় আবিষ্কার করে ; কি হইল তারপর ?—দ্বিতীয় খবর, বাঙালীদের নাকি একটা পল্টন তোলা হইবে, অপেক্ষাকৃত অধুনাতন খবর, আবার চাপা পড়িয়া গেছে। দুটাতেই বড় আশা জাগাইয়াছিল—রোজ একবার এ-কোণ থেকে ও-কোণ পর্যন্ত খুঁজিয়া যান—প্রায় পাগলামি।—একখানি চিঠি—"...সম্পাদক মহাশয়েষু—উলীপাড়া গোবিন্দপুরের হাটে চালের অবস্থা দিন দিনই শঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছে, গত সপ্তাহের অপেক্ষা এ সপ্তাহে মণ পিছু তিনটাকা বর্ধিত হইয়া এখন সাড়ে তেইশ টাকায় দাঁড়াইয়াছে, আরও আশঙ্কার বিষয় যে, কাঁকরের অনুপাত দিন দিনই বাড়িয়া যাইতেছে। এ-বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বারবার আকর্ষণ করিয়াও—"

কাগজটা তাড়াতাড়ি মুড়িয়া ফেলিতে ফেলিতেও একটা শীর্ষের ওপর নজর পড়িয়া গেল—"বস্ত্রাভাবে গর্ভিনীর আত্মহত্যা—"

এই সময় পতিত মণ্ডল আসিয়া উপস্থিত হইল। গঙ্গাধর যেন বাঁচিলেন, বলিলেন—"এস পতিতপাবন, ক'দিন দেখি নি।"

পতিত উঠিয়া আসিয়া চরণ স্পর্শ করিয়া হাতটা কপালে ঠেকাইল, একটু তফাতে মেঝের ওপর বসিয়া বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা এসি নি, একটু ঝঞ্ঝাটে পড়ে গেচলুম কিনা।"

২

পতিত মণ্ডল জাতিতে হরিজন। গঙ্গাধরদের নবপ্রেরণার যুগে—সেই চল্লিশ বছর আগে, পতিতের সঙ্গে সখ্যের সূত্রপাত হয়। ওঁরা মন্ত্র পাইয়াছিলেন বিবেকানন্দের কাছে—"হে ভারত, ভুলিও না, নীচ জাতি,

মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর—তোমার রক্ত, তোমার ভাই। হে বীর, সদর্পে বল, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই।"—সেই অনুপ্রেরণাতেই কোল বাড়াইয়া হরিজন পল্লীতে উপস্থিত হন। 'সখ্য' কথাটা কিন্তু গঙ্গাধরের দিক থেকেই ব্যবহার করা হইল। পতিত মণ্ডল নিজের দিক থেকে সে-স্তরে উঠিতে পারে নাই, বা চাহে নাই। যুগ-যুগের সংস্কার অত শীঘ্র তো যায় না—ঐ পদস্পর্শ করিয়া এক ছাতের নিচে বসিবার অধিকারটুকু পাইয়া সন্তুষ্ট আছে। এর বেশি তোলা গেল না তাকে। কিন্তু একটা বিষয়ে গঙ্গাধর বেশ কৃতকার্য হইলেন, নেশা-ভাঙ প্রভৃতি জাতিগত দোষগুলি ছাড়াইয়া নিজের জাত-ব্যবসায়ে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া উহাকে উহাদের সমাজেই সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দিলেন, এখন গ্রামের সমাজের মধ্যেও পতিত মণ্ডলের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, হউক না কেন হরিজন। আশা করা যায়, দেশের মধ্যেও তাঁহাদের গ্রামের এই মণ্ডলপরিবারের একটা দিন আসিতেছে।

তাহার কারণ, পতিতের মধ্যে যেটুকু সাধ অসম্পূর্ণ থাকিয়া গিয়াছিল, ওর ছেলের মধ্যে সেটা ভালোভাবে মিটাইয়া লইয়াছেন গঙ্গাধর, নিজের হাতে তাহাকে সর্বাঙ্গীণ শিক্ষা দিয়া। সে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। ইংরাজ আমলে তপসিলী জাতি হিসাবে একটি ডেপুটির পদ পায়। অসহযোগ আন্দোলনে সেটি ত্যাগ করিয়া দেশের কাজে নামে। এখন শাসনবিভাগে কোন বিশিষ্ট পদে অধিষ্ঠিত, এর পরের ধাপই মন্ত্রিত্ব।

পতিতপাবন বলিয়া নিজের অভ্যাস মতো কথাটার পুনরুক্তি করিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, পড়ে গেচলুম একটু ঝঞ্ঝাটে। অম্‌রা নিকেচিল, একটু খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। তাই একটু জোগাড়ে ঘুবছিনু—কোথায় পাঁটা রে, কোথায় একটু ভালো ময়দা রে, কোথায় একটু ভালো

ঘি রে, জানেনই তো অবস্থা, পুকুরের মাছ সেও জালের দিকে ভেড়ে না, কি এক অসযোগ মন্তরই সবার কানে দিয়ে দিলেন মহাৎমাজী !—উরির মধ্যে ভাবি বাবাঠাকুরের পা ছুঁয়ে এসি একবার, হয়েই ওঠে না। শেষে বিধেতাপুরুষ বললেন—দাঁড়া, তোর এমনি হবে না সময়।—তা হ্যাঁ বাবাঠাকুর, সাধিনতা জিনিসটা কি ?—এই মাত্তোর অম্‌রার এক চিঠি পেলুম—এই ডাকে—সাধিন্‌তা ডিনার দিতে হবে সবাইকে—আজই সন্দেয়। ডিনারটা জানি—সায়েবদের খানসামাগিরি করে গোড়ার দিকটা কাটল তো আপনার পায়ের ধুলো পাবার আগে ; ধিন্‌তাও না হয় বুঝলুম—ওরা বলত বল্‌ডান্‌স্‌, কিন্তু সাধিন্‌তা বলে আবার আলাদা একটা আচে তা কৈ জানি না তো। কথাটা এর আগে গেচে এক-আধবার কানে, অত গা করি নি, আজ একেবারে শিয়রে সংক্রান্তি হয়ে এসে পড়ল। চিঠি পড়ে দিলে অম্‌রার ছোট ছেলে পুটে, সে মানেটা কিন্তু বলতে পারলে না, শিশুতো একটা ? তখন মনে করলুম, যাই দাদাঠাকুরের কাচে, অনেকদিন পায়ের ধুলোও নেওয়া হয় নি ইদিকে।—এখন, সাধিন্‌তার মানেটা কি হোল ? বিপদের ওপর বিপদ—আজ্‌ই সন্দেয় ডিনার, মিনিসটারও আসচেন। এই দেখুন না চিঠিটা।”

আগুন ধরিয়া গেছে গঙ্গাধরের মাথায়, এ অবস্থাতেও ভোজ খাইয়া বেড়ায় ? তাও সাদা দিশী ভোজ নয়, ডিনার ! অমরেশটাও দলে পড়িয়া গেল শেষ পর্যন্ত ? লিখিতে কলম সরিল কি করিয়া ?—পাণ্ডারাও রহিয়াছে—আসল কাজ সামলায় না, দেশে হাহাকার, হরিজন-গৃহে ভোজ খাইয়া কাগজে ফাঁকা ঢক্কানিনাদ—পপুলারিটি—ভবিষ্যতের ভোট আগলানো !—

বেশ একটু অন্যমনস্ক হইয়া গিয়াছিলেন, নিজেকে সামলাইয়া লইয়া চিঠিটা পড়িতে লাগিলেন—

শ্রীচরণকমলেষু—

আপনাকে পূর্বপত্রে যে ভোজের ব্যবস্থার কথা লিখিয়াছিলাম আশা করি সে বিষয়ে তৎপর আছেন। সাতচল্লিশ সালে ১৫ই আগষ্ট আমরা যে ইংরেজদের নিকট হইতে রাজ্যভার লাভ করি, তাহার এক বৎসর পূর্ণ হইতে যাইতেছে, এবং এই উপলক্ষেই, এই উৎসব। আমাদের সঙ্গে আমাদের মাননীয় মিনিষ্টার মহাশয় এবং কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মচারী থাকিবেন, সর্বসমেত কুড়ি জনের আহারের ব্যবস্থা রাখিবেন। পথে কয়েক জায়গায় কিষাণ-সম্মেলন ও মিনিষ্টার মহাশয় দ্বারা জাতীয় পতাকা উত্তোলন আছে। সেই সমস্ত সারিয়া রাত্রি ৮ ঘটিকার সময় আমরা সকলে ঐখানে উপস্থিত হইব। সব যেন প্রস্তুত থাকে, কেন না সঙ্গে সঙ্গে আহার সারিয়া মিনিষ্টার মহাশয় এক মাইল দূরে রায়গঞ্জের ষ্টিমার-ঘাটে কিষাণ-সম্মেলনে বক্তৃতা দিবার জন্য যাত্রা করিবেন। আমরা সেইখান থেকে রাত্রি দশটার সময় আমাদের স্পেশাল লঞ্চে ফিরিয়া আসিব।

আপনি ও জননীদেবী আমার শতকোটী প্রণাম লইবেন এবং সবাইকে আশীর্বাদ জানাইবেন।

ইতি—

প্রণত সেবক

শ্রীঅমরেশ মণ্ডল।

পুনশ্চ—

এটি সাধারণ ভোজ হইবে না। স্বাধীনতা-ডিনার নাম দিয়া সবাইকে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইতেছি। অনুগ্রহ করিয়া লক্ষ্য রাখিবেন সমস্ত

ব্যবস্থাই যেন তাহার উপযোগী হয়, আমরা এত সাধনা করিয়া যে বস্তু লাভ করিয়াছি তাহার যেন মর্যাদা রক্ষা হয়।

চিঠিটা পড়িয়া ভিতরের রাগে গঙ্গাধরের কান দুইটা পর্যন্ত গরম হইয়া উঠিল। নিজেকে সংযত করিয়া লইতে একটু বিলম্ব হইল, তাহার পর সহজ ভাবেই বলিলেন—"তুমি কথাটার যা অর্থ করেছ পতিতপাবন, তা প্রায় কাছাকাছি গেছে। মাথার চুল পাকলো, বেশি ভুল তো আর করবে না। স্বাধীনতা হচ্ছে তোমরা যাকে বল—স্বরাজ, যার জন্যে এত কাণ্ড হোল। এখন এই স্বরাজটা যে পাওয়া গেল তার মধ্যে সাপ আছে কি ব্যাঙ আছে তাই নিয়ে কান্নাকাটি না করে, একটু ধিন্‌তা-ধিন্‌তা দরকার নয়? তাই হয়েছে স্বাধীনতা, তারই ডিনার। অবশ্য বল-ডান্সের মতন কিছু নয়, তবে একটু ফুর্তি করাই কি নাচ নয়? এই যে বলি, আমাদের মনটা নেচে উঠছে, সে কি আর ঘুঙুর পরে সত্যিকার নাচ?—সেই রকম আর কি। বুঝলে না?"

পতিত মণ্ডল একটু নড়িয়া চড়িয়া গুছাইয়া বসিল, ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আমি বল্লুম না?—বলি, পতিত, ভেবে সারা হচ্চিস কেন?—চল্‌ বাবাঠাকুরের কাচে, গেলেই সঙ্গে সঙ্গে মুসকিল আসান হয়ে যাবে, চিরজন্মটা তাই হয়ে এল, আর আজ হবে না?—তাহলে সাধিন্‌তা হোল আমাদের এই স্বরাজ। আমাদের চাষাভুষোদের মধ্যে সেই যে বলে 'মসনে কলকেতায় গিয়ে তিমি হয়েচে'—সেই গোচের। এইবার বুঝলুম বাবাঠাকুর। হ্যাঁ, তা কত কষ্টে পাওয়া গেল স্বরাজ, মনটা নেচে উঠবে বৈকি বাবাঠাকুর, একটা হারানো গরু পাওয়া গেলে ইচ্চে করে—"

"তবেই বোঝ। অমরেশ স্বরাজই লিখত, তাহলেই বুঝতে তুমি

সোজা কথাটা, কিন্তু ঐযে ডিনার রয়েছে—একটু সামঞ্জস্য করে লিখলে —স্বাধীনতা, পেটে বিত্থে রয়েছে কিনা—"

পতিতপাবন গদগদ হইয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে বলিল—"সব আপনার পায়ের ধুলোর মহিমে বাবাঠাকুর। সামঞ্জস্যি-জ্ঞান থাকবে না? কার হাতে মানুষ হোল দেখতে হবে তো। তা এখন করতে হবে কি আমায়? একবার তো নিকেচিল ভোজের কথা। আমি পাঁটা রে, ময়দা রে, হ্যানরে, ত্যানরে—জোগাড় করে থুয়েচি। আজ আবার নিকচে মামুলি ভোজ নয়। তাহলে একটা সমিস্যে দাঁড়াচ্ছে না? আমি বললুম—পতে, এ তোব কম্ম নয়, চল বাবাঠাকুরের কাচে। তুই আর সব ঠাঁই মুড়ুলি করগে, তবে যেখেনে খাটবে না সেখেনে এগুস নি, ন্যাজে-গোবরে হয়ে মরবি।—তাহলে, বাবাঠাকুর—"

কি একটা চিন্তার স্রোত চলিতেছে ভিতরে ভিতরে, তাহাতেই গঙ্গাধরের মুখ হইতে সেই প্রচ্ছন্ন ক্রোধের ভাবটা কাটিয়া গিয়া ধীরে ধীরে মুখটা উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে। বলিলেন—"এই দেখো, পতিতপাবন আমাদের বুঝেও বোঝে না! সোজা পথ ধরে এগোও না, আপনি পরিষ্কার হয়ে যাবে সব। এই ধরো শ্রাদ্ধের ভোজ আর অন্নপ্রাশনের ভোজ কি এক হয়েছে কখনও?"

"আজ্ঞে তা কি হয় কখনও, না, পারে হতে?"

"তাহলে তোমার মামুলি ভোজ আর স্বাধীনতা-ডিনার এক হচ্ছে কি করে?"

পতিতপাবন আবার নড়িয়া চড়িয়া মুখে হাসি ফুটাইয়া ভালো করিয়া বসিল, বলিল—"আমি তাই বললুম না?—পতে তুই যতই মুড়ুলি কর না কেন—"

"আচ্ছা এই আর একটা কথার জবাব দাও! একরকম তো নয় দুটো ভোজ, কিন্তু সরঞ্জামের কোন তারতম্য আছে?

সেই তেল, ঘি, মসলা, চাল-ডাল, আলু-পটল—আছে কি কোন ইতরবিশেষ ?"

"আজ্ঞে না, শুধু মাছটা-মাংসটা শ্রাদ্ধতে আর—"

খুব কুণ্ঠার সহিত পতিত মণ্ডল ভুলটা শুধরাইয়া দিতে যাইতেছিল, গঙ্গাধর হাসিয়া বলিলেন—"এই দেখো! পতিতপাবনের আমাদের আজ পদে পদেই ভুল! শ্রাদ্ধ তো আর অন্নপ্রাশন নয় গো যে, তাতে মাছ-মাংস দেওয়া চলবে। যেগুলো চলবে তাতে আছে তারতম্য—সেই তেল মসলা চাল ডাল আলু—"

"আজ্ঞে, তফাৎ আর কৈ ?"

"অথচ বলছ দুটো ভোজ একরকম নয়, তাহলে প্রভেদটা দাঁড়াচ্ছে কোথায় ?"

পতিতপাবন বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল। গঙ্গাধর একটু সময় দিয়া বলিলেন—"দাঁড়াচ্ছে এইখানে—তুমি একটাতে ঐ মাল-মসলা দিয়ে রাঁধলে ভাত, ঘণ্ট, চেঁচকি, ডালনা, চচ্চড়ি, অম্বল, পায়েস। একটাতে রাঁধলে সাদা পোলাও, ছক্কা, দম, কালিয়া, চাটনি, ক্ষীর। তাহলে তারতম্যটা দাঁড়াচ্ছে কোথায় ?—না, রান্নায়! বটে কিনা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, রান্নাতেই তো দাঁড়াচ্চে, তারতম্যিটা তো রান্নাতেই গিয়ে দাঁড়াল।"

"এইবার মিলিয়ে দেখো। তুমি জোগাড় করেছ পাঁঠা, মাছ, ময়দা, সরু চাল, ঘি, তারপর তরি-তরকারি। ওদিকে দই, সন্দেশ, রসগোল্লা,—এই তো ?—বেশ, রান্নার ব্যবস্থাটা করছ কি ?"

"আজ্ঞে, অম্বরার মাকে বললুম, দেখ, কলকেতা থেকে তা-বড় তা-বড় সব এসচে, পোলাও আর লুচি দুটোরই ব্যবস্থা করি, তারপর শাক ভাজা, পটল ভাজা, কুমড়োর ছক্কা, মাংসর কোর্মা, মাছের —"

গঙ্গাধর হাতটা উঁচাইয়া বলিলেন—"বুঝলুম, সেই মাছের কালিয়া,

ছোলার ডাল, ছ্যাঁচড়া, চাটনি—কিন্তু তাতে স্বাধীনতা-ডিনারটা হচ্ছে কোত্থেকে? এতো চৌধুরীদের বাড়ির বৌ-ভাত হয়ে গেল।"

মুখের পানে আড়চোখে চাহিয়া গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। একটু পরে আবার বলিলেন—"কৈ গো মোড়লের পো, উত্তুর দিচ্ছ না যে? —এতো তোমার সেই চৌধুরী বাড়ির বৌ-ভাত হয়ে গেল, ওর সঙ্গে দই ক্ষীর আর চারটে মিষ্টি জুড়ে দিলেই নিশ্চিন্দি।"

পতিতপাবনের আবার আগের অবস্থা হইয়া পড়িয়াছে। অপ্রতিভ-ভাবে বলিল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাইতো দেখি, এযে চৌধুরী বাড়ির বৌ-ভাত হয়ে পড়ল!"

"তাহলেই ভেবে দেখো, অমরেশ তোমায় আন্দাজ করে নিয়ে ঠিকই লেখে নি?—নিয়ে যাচ্ছি স্বাধীনতা-ডিনার খাওয়াতে—মিনিষ্টার পর্যন্ত রয়েছেন, তা যদি চৌধুরী বাড়িব বৌ-ভাত খেয়েই ফিরতে হয়—তাব চেয়ে বাবাকে একটু স্পষ্ট করেই লিখে দিই—একখানা চিঠির ওয়াস্তা তো?—"

"তাহলে বাবাঠাকুর, এখন উপায়? আর সময়ই বা কোথায়?"

"উপায় তো হাতেই রয়েছে। মাল তো তোমার নতুন জোগাড় করতে হচ্ছে না—ঐ ময়দা, ঐ চাল, ঐ পাঁঠা, শুধু রান্নার তরকিবটা দিতে হবে বদলে—যাতে ঐ জিনিবেই খিন্‌তা-বিন্‌তা ভাবটা আসে। বুঝছ না?—তাদের খিন্‌তা-খিন্‌তা ভাবটা আসত বোতলের গুণে, সে তো তোমার দেখা-ই। এরা তো আর সেদিকে যাবে না, মহাত্মাজীর চেলাই তো?—এদের ও-ভাবটা জাগাতে হবে রান্নাব তরকিবে। সেটা তোমার আসে কি? তুমি তো সায়েবের খানসামাগিরিই কবেছ, এসবের হদিস তো জানা নেই—"

"আজ্ঞে, আমি তো সায়েবেরই খানসামাগিরি কবেচি, এসবের হদিস জানব কোত্থেকে?—তাহলে?"

"তাহলে জানে এমন লোক খুঁজে বের করতে হবে।"

"এমন লোকটা গ্রামের মধ্যে কে বাবাঠাকুর?"—পতিত মণ্ডল ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।

গঙ্গাধর গড়গড়া টানিতে টানিতে অনেকক্ষণ চক্ষু ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া খোঁজাখুঁজি করিলেন, তাহার পর বলিলেন,—"তাইতো দেখছি, সে লোক কোথায় গ্রামে?—তাহলে কি—আমাকেই নামতে হবে শেষ পর্যন্ত?"

পতিতপাবন একেবারে পায়ের ওপর হুমড়ি খাইয়া পড়িল, বলিল—"তাই নামুন বাবাঠাকুর, ও আপনার দ্বারাই হবে; কত গুণ ধরেন ঐ শরীরে তা আমার তো জানা, ছিচরণের বুড়ো আঙ্গুলটুকু ঠেকিয়ে আর একবার অহুল্যে-উদ্ধার করুন কিরপা করে—যা চান, যত লোক চান জোগাড় করে দিচ্ছি।"

"অত হৈ চৈ-এর ব্যাপার নয়, সবই যেমন হয় হবে। আমি শুধু আমার তরকিবটুকু করে দোব, তার মধ্যে হৈ-চৈ নেই, একরকম মন্তর-পড়া গোছেরও বলতে পার। তবে মন্তর গোছেরই যখন ব্যাপারটা, সে ক্ষেত্রে আমি যে ঘরটিতে বসে কাজ করব সেটিকে নিরিবিলি রাখতে হবে বাপু, মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করতে হবে কিনা, বুঝলে না।"

"আজ্ঞে, বুঝব না এ-সামান্য কথাটা!—মন্তর,—তাহলে সেতো পূজোর ঘর হয়ে দাঁড়াল কিনা।"

"শুধু মন্তর নয়, জোগাড়-যন্ত্রও চাই। তা সে সবের জন্যে তোমায় ভাবতে হবে না, আমি নিজেই ঠিক করে নিয়ে যাব। তুমি তাহলে যাও, আর সময় নেই তো?"

৩

বেশ বড় দালান-বাড়ি পতিতপাবনের, কিন্তু গঙ্গাধরের পরামর্শেই সামনের প্রাঙ্গণে একটা হোগলার ম্যারাপ দাঁড়-করানো হইয়াছে। রঙিন

কাগজ আর দেবদারুর পাতা দিয়া সাজানোও হইয়াছে। খাওয়ার ব্যবস্থা টেবিলে। এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে জোগাড় করিয়া ম্যারাপের মাঝখানে বসানো হইয়াছে, তাহার ওপব চাদর, তাহাব ওপর ফুলদানিও। একটা

গ্যাসলাইট বাড়িতেই ছিল, আবও দুইটা জোগাড় হইয়াছে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সব কিছুর ব্যবস্থা ঠিক করিয়া সকলে অভ্যর্থনার জন্য প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। আটটার অল্প কিছু পূর্বেই দলটি আসিয়া উপস্থিত

হইল। সময় নাই, সামান্য একটু পরিচয়াদির পরই আহারের উদ্যোগ করিয়া দিতে হইল, সকলে টেবিলে বসিল।

আরম্ভ করার সঙ্গে সঙ্গেই কুড়ি-পাটি দাঁতের নিচে কট-কট-কটাস করিয়া একটা শব্দ উঠিল। সকলেই একবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া শব্দটা চাপিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু দু'এক গ্রাসেই বোঝা গেল অসম্ভব, পোলাওয়ের চালের সঙ্গে কম করিয়া ধরিলেও আধাআধি কাঁকর মেশানো। লুচিতে গিয়া পড়িল সবাই, একটু আগপিছু করিয়া যতটা সম্ভব আব্রু বাঁচাইয়া। অসম্ভব, একে তো বোধহয় বারো আনা ভেজি-টেব্‌ল ঘিয়ে ভাজা, তাহার ওপর টানিয়া ছিঁড়িতে আহত দাঁতের শক্তিতে আর কুলায় না—ক্রমে এক একটা শক্ত টুকরাও বাহির হইতে লাগিল, কন্না, মনে হয় যেন কিছুর বিচি—ময়দার সাহচর্যে সে যে কি বিচি নিশ্চয় বুঝিতে বাকি রহিল না কাহারও। ঘাড় নিচু হইয়া আসিয়াছে সবার। এদিকে তরকারি মুখে তোলা যায় না, তিসি এবং বোধ হয় তাহার চেয়েও কোন অপাঙ্‌ক্তেও তৈলের দুর্গন্ধ। মাছের আরও দুরবস্থা, মাংসের আবার ততোধিক।

ময়লা তেল, তাহাও পর্যাপ্ত নয়, আলোগুলা একসঙ্গে এবং দ্রুত নিভিয়া আসিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি চার-পাঁচটা সাধারণ লানঠেন্ আনিয়া সেগুলার স্থানে বসান হইল। অল্প সময়ের মধ্যে সেগুলার শিখা সুপ্রচুর ধূমের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া বাঁচিল। এদিকে পতিতপাবন একটি জীর্ণ আধময়লা আঙরাখা আর একটি সংক্ষিপ্ত বস্ত্র পরিয়া হাতজোড় করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, অনুরোধের দ্বারা সবাইকে আহারে উৎসাহিত করিয়া। এটাও গঙ্গাধরেরই ব্যবস্থা, বলিয়াছিলেন—"ওকি পতিতপাবন, আজ কখনও ভালো জামা প'রে বেরোয়? মনে করবে—দেখেছ, ব্যাটা হরিজনের টাকা হয়েছে, ভদ্র সেজে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে—টাকা হওয়া না হওয়া আবার ওদেরই হাতে কিনা—"

যাহারা পরিবেশন করিতেছে তাহাদের পরিধেয়েরও ঐ অবস্থা, যাহারা আশেপাশে দাঁড়াইয়া দেখিতেছে, তাহাদেরও। ঘটে বুদ্ধি নাই এমন তো নয়, কিছু একটা চক্রান্ত যে আছে কোথাও সেটা বোধ হয় ডিনারভোজীদের অনেকেই আঁচ করিয়াছে, লুচি পোলাও কোন রকমে ডিঙাইয়া মিষ্টান্নে গিয়া পড়িল,—রসমুণ্ডির মতো ছোট ছোট সন্দেশ, তাহার বোধ হয় পনের আনাই চালের পিটুলি, চিনি নাই বলিলেই চলে। রসগোল্লা কিসের বোঝা যায় না, মনে হয় এর মধ্যেও তেঁতুলের বিচির অধিষ্ঠান হইয়াছে, অমন জলের মতো পাতলা রস, তাহারও এতটুকু প্রবেশাধিকার নাই।

গঙ্গাধরও করজোড়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আহারে উৎসাহিত করিতেছেন, বলিতেছেন—"আপনাদেব হাত না চললে অপযশটা আমারই হবে, পতিতপাবন তো নিমিত্ত মাত্র—সমস্তদিন খেটে খুটে আমিই কোন রকমে এইটুকু দাঁড় করিয়েছি—নেহাতই বিদুরের আয়োজন—"

অমরেশ মাথা তুলিতে পারিতেছে না।

দৈবও প্রতিকূলতা করিল, পাতলা একটু মেঘ করিয়া আসিয়াছিল, মন্থর ধারায় বৃষ্টি নামিল।

প্রতিকূলতা, না, আনুকূল্যই?—সবাই উঠিয়া বাঁচিল।

পরদিন সকালে পতিতপাবন বিষণ্ণভাবে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া নিজের জায়গাটিতে বসিল। বলিল—"বাবাঠাকুর, এ কি হোল?"

পূতচরিত্র পুরুষ, চিরকাল ভালোই করিয়াছেন ওর, আজ পতিতপাবনের যা কিছু প্রতিষ্ঠা সব গঙ্গাধরেরই জন্য। শিক্ষা দিবার এতবড় সুযোগটাকে প্রাণ ধরিয়া আর হাতছাড়া করিতে পারেন নাই, তবু মনটা খুব ব্যথিত বৈ কি।

বলিলেন—"সমস্তদিন ছুটোছুটি ক'রে বেড়িয়েছে, পেট কাঁদবেই, তবু এটুকু দরকার ছিল মোড়লের পো, তা আমি ঘুরে ঘুরে সবাইকে বলেই

দিয়েছি এ আমার কীর্তি। যত কিছুই হোক, সবার বুদ্ধি আছে তো—তোমার ঘাড়ে দোষ চাপাবে না।—আর অমরেশের কথা বলছ?—"

একটা স্নেহের গালাগাল দিয়া বলিলেন—"ওরও একটু শিক্ষা দরকার ছিল পতিতপাবন, বড্ড ও ওগুলোর দলে ভিড়ে গেছে। তা ওর কিছু অপকার করতে পারবে না জেনে রেখো। উপায় নেই যে করবার সে খোঁজটা রাখি বলেই এটা করলাম। বরং ও যে একদিন মিনিষ্টার হবেই একজন, এই ধাক্কায় তার জন্যে ভালো করে তোয়ের হয়ে রইল। মনে কোরো এটা ওকে আমার আশীর্বাদই।"

মা বলিয়াছে আজ রাত্রে খাওয়া বন্ধ। বকুনি আর তাহার ওপর উত্তম মধ্যম এক প্রস্থ যা হইয়াছে তাহাতে মিনুর স্পৃহাও নাই আহারে। বাড়ির মধ্যে একটু যা আদর তা এক বাবার কাছে। তাস খেলিয়া কখন যে ফিরিবে!—ততক্ষণ কি এত দুঃখ-কষ্ট লইয়া বাঁচিবে মিনু? বেশ হয় যদি না বাঁচে—বাবা আসিয়া মাকে বলে—আহা, এমন করে মারলে মেয়েটাকে যে শেষে—

চোখের কোণ দিয়া বালিশের ওপর অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। তাহার পর শ্লেটের লেখা যেমন মুছিয়া যায়, মিনুর মনে হইল সেই চোখের জলে এদিককার সব আস্তে আস্তে ধুইয়া মুছিয়া গেল।—মিনু দেখিতেছে একটি যেন প্রকাণ্ড বাড়ি, তাহার সামনেটা অনেকটা রায় চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের মতো—

কিন্তু স্বপ্নের কথা পরে হইবে, আগে এত নির্যাতনটা কিসের জন্য সেই কাহিনীটাই বলা যাক।—

আজ ছিল লক্ষ্মীপূজা। একেবারে শেষ রাত্রে মা উঠিয়া শাঁখ বাজাইয়া যখন জলপিঁড়া স্থাপন কবিল, মিনুর ঘুমটাও গেল ভাঙিয়া। বাহিরে আসিয়া রকের ওপর দাঁড়াইল, এই সময় নাকি মা-লক্ষ্মী তাঁহার স্বর্গের বাড়ি থেকে নামিয়া আসেন।

সামনের আকাশটায় একটু একটু আলো, আর ঠিক সেই আলোর ওপরটায় দপদপে তারার মতো কি। মিনু মাকে জিজ্ঞাসা করিল—"ঐ নাকি মা-লক্ষ্মীর রথ মা?" মা বলিল—"হ্যাঁ, রথ। তুমি কিন্তু ঘুমাওগে, ঠাণ্ডা লেগে যাবে এত ভোরে।"

মিনু দাঁড়াইয়া রহিল, দেখিবে ওঁর আসাটা।—সত্যই তো, রথটা আস্তে আস্তে যেন নামিয়া আসিতেছে, আর সত্যই তো, নিচের আকাশ-টায় আরও আলো, তাহার পর আরও আলো, তাহার পর আরও—একেবারে নিচে মেঘের টুকরার মতো ছোট ছোট সিঁড়িগুলি ঐ রাঙা হইয়া উঠিল—সোনার জলের ছড়া পড়িয়াছে। মিনু আজ দেখিবে, নিশ্চয় দেখিবে, ওই সিঁড়ি দিয়া নামিয়াই ঠাকুর মিনুদের চৌকাঠে পায়ের আলপনার ওপর তাঁহার আলতাপরা রাঙা পা দুটি রাখিবেন, তাহার পর আলপনায় আলপনায় পা দিয়া পূজার ঘরে আসিয়া উঠিবেন।

মা কাজের মধ্যে চঞ্চলভাবে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। শাঁখটা ধুইয়া ঘরে রাখিয়া আসিল, দোরে দোরে জলছড়া দিল, তাহার পর বাড়ির ওদিকে কি একটা কাজে চলিয়া গেল।

আকাশের সিঁড়ি একেবারে সোনা হইয়া উঠিয়াছে, বোধ হয় মা-লক্ষ্মী দিলেন পা। হয় কিনা সোনা, মায়ের কাছে শোনে নাই গল্প মিনু!—মা অন্নপূর্ণার পা ঠেকিয়া নৌকার কাঠের সেঁউতি সোনা হইয়া গিয়াছিল।

মা আসিয়া বলিল—"ওমা, তুই এখনও দাঁড়িয়ে! শুতে বললাম না গিয়ে?—ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে।"

"আমি দেখব আজ, হ্যাঁ মা, লক্ষ্মীটি!"

মা একটু বিরক্ত হইয়া বলিল—"না, যাও ঠাণ্ডা লাগবে, নোতুন ঠাণ্ডা পড়েছে।—আর, কেউ চেয়ে থাকলে কি দেন দেখা? টের পেলেই মিলিয়ে যান।"

"যতক্ষণ না টের পান দেখব মা।—হ্যাঁ, ঠাকুর দেখলে লাগতে পারে নাকি ঠাণ্ডা?"

মা মেয়ের রোগ জানে, একটু ভাবিল, বলিল—"তবে থাকো, আমার কি, করলে অসুখ পেসাদ খেতে পাবে না।"—মা চলিয়া গেল।

তবুও খানিকটা দাঁড়াইয়াই রহিল মিনু, ঠাকুরকে দেখাটা ভালো কি

প্রসাদ খাওয়াটা, ঠিক করিতে পারিতেছে না।—এদিকে আকাশের সোনা আরও জ্বলজ্বলে হইয়া উঠিতেছে, এদিকে প্রসাদ—আগে নৈবেদ্য,—শশা, কলা, খেঁজুর, নারকল নাড়ু, ক্ষীরের নাড়ু। তাহার পর ভোগ, মুগের ডালের খিচুড়ি, যত রকম তরকারি হইতে হয়, কত রকম ভাজা, তাহার পর পায়েস, পিঠা, দই, অমৃতী—

আকাশে সোনার পানে একবার চোখ দুইটা তুলিয়া মিনু মুখটি চূণ করিয়া আবার বিছানায় গিয়া উঠিল।

২

যখন ঘুম ভাঙিল তখন অনেকক্ষণ মা-লক্ষ্মী আসিয়া গেছেন। দাদা একাই ফুল তুলিয়া আনিয়াছে, বড়দিদি স্নান সারিয়া চুলে গেরো দিয়া চন্দন ঘষিতেছে, রান্না ঘরে মায়ের ভোগ রান্নাও অর্ধেক শেষ। এবার যেন কি হইয়া গেল, ওদিকে মা-লক্ষ্মীর আসাও দেখা গেল না, এদিকে পূজারও গেল অনেকখানি বাদ পড়িয়া, না হইল ফুল-দূর্বা তোলা, না হইল চন্দন ঘষা। মুখটা ভার করিয়া মিনু কিছুক্ষণ এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইল। কাহার ওপর যে রাগ করিবে বুঝিতেছে না।

একবার দাদার সামনে পড়িয়া যাইতে প্রশ্ন করিল—"তুই এখনও চান করিস নি মিনু? ফুল তুলতেও গেলি নি আমার সঙ্গে—"

"এইতো উঠলাম।"

"কেন রে? পুজোর দিন এত দেরি করে? অসুখ-বিসুখ করে নি তো? দেখি তোর গা।"

মিনুর বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল। কিন্তু এই সময় দাদাকে বাহির হইতে কে ডাকায় দাদা চলিয়া গেল। আর নয়, একটা যেন ফাঁড়া কাটিয়া গেল। অসুখ কি করিয়া করে, মিনুর মনে নাই। তবে এটা

দেখিয়াছে যখনই কেহ অসুখ করিয়াছে কিনা দেখিবার জন্য গায়ে হাত দিয়াছে, তখনই বেশি না হইলেও একটু অসুখ কেমন করিয়া যেন পড়িয়াই গেছে ধরা। মিনুর মনে হয় ওটা যেন ক্ষিদে পাওয়ার মতো, হাজার খাইলেও কোথায় যেন একটু থাকেই লাগিয়া। দাদা তবুও রাত থাকিতে ওঠার কথাটা জানে না, মা যদি আবার এই কথা বলে তাহা হইলে সর্বনাশ।

মিনু আর রাগ পুষিয়া না রাখিয়া তাড়াতাড়ি স্নান করিয়া লইল। তাহার পরই পুরুত ঠাকুর আসিলেন, শাঁখ ঘণ্টা ধূপ-ধুনার সঙ্গে পূজার মধ্যে মনের খেদটুকু কাটিয়া গেল মিনুর। যেটুকু বা রহিল, নৈবেদ্যর সঙ্গে কোথায় তলাইয়া গেল। তাহার পরেও ছিটেফোঁটা যেটুকু বাকি থাকিল, ভোগের সঙ্গে। মা-লক্ষ্মীর প্রসাদ হয় বড় ভালো, মা দৃষ্টি দিয়া উচ্ছিষ্ট করিয়া দেন কিনা। পায়েসটি আবার এমন চমৎকার হইয়াছিল, মিনুর মনে হয় মাও নিশ্চয় একেবারে দৃষ্টি সরাইতে পারেন নাই ও-থেকে।

আজ স্কুল যাওয়া নাই, নৈবেদ্য-ভোগে শরীরটা একটু ভারী করিয়া দিয়াছিল, মিনু একটু ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। যখন উঠিল দেখে আর সবাইও নিজের নিজের ঘরে ফোঁস ফোঁস করিয়া ঘুমাইতেছে—কাল থেকে বেশ একচোট মেহনত গেছে তো। শুধু মা রান্না ঘরে। চমৎকার একটি গন্ধ ভাসিয়া আসিতেছে ' ক্ষীর যখন তৈয়ার হয়, একটু একটু সাদা ধোঁয়া উঠিতে থাকে, সেই সময়ের গন্ধ। মিনু আস্তে আস্তে গিয়া চৌকাঠের ওদিকে দোরে পিঠ দিয়া বসিল, মিনি-বেড়ালটা অন্য পাল্লাটার গা ঘেঁসাইয়া বসিয়া ছিল, সেটাকে নিজের কোলে টানিয়া লইল মিনু। মা একবার দেখিয়া লইয়া একটু হাসিল।

মিনু জিজ্ঞাসা করিল—"হাসছ কেন মা?"

"দুটি হ্যাংলাকে একসঙ্গে দেখছি, পাবে না একটু হাসি?—না, মা-লক্ষ্মীর শেতলের ক্ষীর, ও সব মনে করতে নেই। এক্ষুনি উঠে এলি যে?"

"আর কত ঘুমুব, মেয়েদের অত আছে ঘুমোতে?—শেতলে খালি বুঝি ক্ষীর খান মা-লক্ষ্মী, মা?"

কাজের মধ্যে গল্পের দোসর পাইয়া মায়ের বোধ হয় একটু ভালোই লাগে। মনটি আজ সেবায়, পূজায়, ভক্তিরসে টলমল করিতেছে, ভালো লাগে ঠাকুরকে লইয়া একটু আদবার-অনুযোগের কথা কহিতে, বলিল —"হ্যাঁ, ঐ শুক্‌নো ক্ষীরের সন্দেশ করে দোব, নট-ক্ষীর রইল এক বাটি, নারকল নাড়ু আর খানকতক চন্দ্রপুলি আছে। খান তো ভারী, শুধু খেটেই মরা। তেমন ভাগ্যি করেছি যে খাবেন মা?"

একটি কালো পাথরের রেকাবিতে টাটকা শুক্‌ন ক্ষীর তাল করা রহিয়াছে, কড়ায় নট-ক্ষীরের সাদা সাদা ধুঁয়া উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছে বাহিরে থেকে যে গন্ধটা পাইয়াছিল, সেটা সমস্ত ঘরটিতে যেন বোঝাই হইয়া রহিয়াছে।—মিনুর মনের একেবারে কোথায় একটু মনে হইতেছে ভাগ্যিস মা-লক্ষ্মী খান না?—কিন্তু সে-কথা ভাবিতে নাই। মিনু মায়ের মতনই একটু নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিল—"তেমন ভাগ্যি হলে বুঝি খান্ মা?"

"খান না? আমার বাপের বাড়িতেই তো একবার খেয়েছিলেন, অবিশ্যি সে অনেক দিনের কথা, আমার ঠাকুরমার শাশুড়ির আমলে। কোথাই বা আমবা সেরকম ভক্তি পাব, কোথাই বা সে নিষ্ঠে?"

গল্প করিতে করিতে ওদিকে ক্ষীর হইয়া গেল। কড়াটা নামাইয়া একটি ছোট আর একটি বড় পাথর বাটিতে ঢালিয়া রাখিল; বলিল— "যাই, এবার রেখে দিগে পূজোর ঘরে।"

বেশ লাগিতেছিল দেখিতে। মিনু প্রশ্ন করিল—"ক্ষীরের নাড়ু পাকালে না মা?"

"না মা, এখন আর পাচ্ছি না, কোমর পিঠ টন্ টন্ করছে। একটু গড়িয়ে নিগে। উঠি তখন টপটপ করে চাঁচে বসিয়ে তুলে নোব।—চল্ দিকিন, পারবি একটু কোমরটা টিপে দিতে?"

পূজার ঘরে সব তুলিয়া রাখিয়া শিকল তুলিয়া দিয়া ওদিককার বারান্দার মেঝের ওপর মাদুর পাতিয়া শুইয়া পড়িল। মিনুর হাত খুব মিষ্ট, একটুর মধ্যেই ঘুম আসিয়া গেল।

৩

ঠাকুরের প্রসাদের এটা একটি দোষই হোক বা গুণই হোক—বড় শীঘ্র হজম হইয়া যায়, আর কাহারও হয় কিনা জানে না মিনু, কিন্তু মিনুর তো হয়, অন্তত আজ যে হইয়াছে এতো স্পষ্ট দেখিতেছে। মনে অবশ্য না ভাবিবার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে মিনু, কিন্তু নাক তো মন নয়, সেখানে ক্ষীরের গন্ধটি যদি লাগিয়া থাকে, কি করে বেচারি?

কোমর পিঠ টিপিয়া দিতে মা যখন ঘুমাইয়া পড়িল, মিনু উঠিয়া বাহিরে আসিল। সব ঘরে সবাই তখনও ঘুমাইতেছে, একটু ভিতরে গিয়া এ-ঘর ও-ঘর করিল, এমন যদি কিছু একটু পাওয়া যায় যাহাতে ক্ষুধাটা মেটে, অন্তত নাকের গন্ধটা যায়। ওটাও থাকিতে নাই কিনা, মা-লক্ষ্মীর শেতলের জিনিস। কোন ঘরে কিছু নাই, শুধু বড়দির ঘরে একটা বিস্কুটের টিন, খোকা যখন আবদার ধরে, দুটি একটি করিয়া দিয়া ভোলায় দিদি। আলমারীতেই রোজ থাকে টিনটা, আজ কি করিয়া টেবিলের ওপরেই থাকিয়া গেছে।

বিছানার ওপর দিদি ওদিকে মুখ করিয়া খোকাকে লইয়া ঘুমাই-তেছে। মিনু চুপ করিয়া একটা আঙুল কামড়াইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ছোট বোনপোকে নিজের ভাগ থেকেই দিতে হয়, তাহার জিনিষ খাইতে নাই। মাও বলে, দিদিও পিঠে হাত বুলাইয়া, আদর করিয়া বলে—"লক্ষ্মীটি, তুই মাসী হোস মীনু, খাস নি ওর বিস্কুট, ভালো বিস্কুট একে

যায় না পাওয়া পয়সা দিয়েও।”—দিদি দেয়ও, নিজের হাতে যাহাতে নিজে লইয়া না খায় মিনু।

মিনু অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর হঠাৎ মনে পড়িল—কিন্তু নাক থেকে ক্ষীরের গন্ধ যে সরাইতে হইবে, ওটা বোনপোব জিনিষ খাওয়ার চেয়ে বড় পাপ নয়? এই কথাটুকু মনে হওয়াব সঙ্গে সঙ্গে মিনুর মনের খুঁৎখুঁতুনিটা কাটিয়া গেল, মিনুর মনে হইল মা-লক্ষ্মীই দিলেন কাটাইয়া, তিনি তো কাহাকেও দিয়া পাপ করাইতে চান না।

মিনু আগে দুইটা লইল, তাবপর আরও দুইটা, তাবপর আবও দুইটা লইবে কিনা ভাবিতেছে, খোকা নড়িয়া উঠিল। মিনু কাঠ হইয়া সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর দিদি ঘুমের ঘোরেই তাহাকে ঠুকিয়া ঠুকিয়া আবার ঘুম পাড়াইয়া দিলে পা টিপিয়া টিপিয়া চারিটা বিস্কুট লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিস্কুটের আবার একটা রোগ, কুট কুট করিয়া শব্দ হইবে। মিনু একেবারে উঠানের ওদিকে চলিয়া গেল; ওদিকে রান্না ঘর, ভাঁড়াব ঘব, তারপর খিড়কির পুকুরের দিকে যাওয়ার গলিটার পরে ঠাকুর ঘব।

মনে হইতেছে নাকে আর ক্ষীরের গন্ধটা নাই, বিস্কুটেব গন্ধটা তাড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু খিদেটা যে আবও বাড়িয়া গেল! খিদের ওপর কম জিনিস খাইলে এটা হয়ই; মিনুর মনে ছিল না। পরশু রায় চৌধুরীদের বাড়ি নেমন্তন্ন গিয়া প্রথমে একটু শাকভাজা আর লুচি খাইয়া নিজেকে যেন আর সামলাইতে পারা যায় নাই। মনে ছিল না মিনুর, তাহা হইলে কি আর খায় বিস্কুট দুটি?

এই সময় আর একটা কাণ্ড হইল, মিনুর মনে হইল ক্ষীরের গন্ধটা হঠাৎ আবার যেন নাকে ফিরিয়া আসিতেছে। রান্না ঘরের সামনে দাঁড়াইয়াছিল মিনু, মনে হইল—দেখিতো গন্ধটা নাকেই, কি পূজার ঘর থেকে আসিতেছে—

দরজার ফাঁকে নাক দিয়া ঠিক বোঝা গেল না। তাহা হইলে করা যায় কি এখন? বিস্কুটেও যায় না এমন পাপ কি করিয়া সরায় মিনু নাকের মধ্যে থেকে?

ইহার পরেই সব যেন কি করিয়া এক সঙ্গে হুড়মুড় করিয়া হইয়া গেল, একেবারে উল্টা কাণ্ড—কি করিয়া যে হইল মিনু এখন পর্যন্ত

বুঝিয়া উঠিতে পারে না,—তাড়াতাড়ি উঠানের ওপার থেকে তেপাইটা আনিয়া পূজার ঘরেব শিকলটা খুলিয়া ফেলিল মিনু। একটু ভাবিল, তাহার পর তেপাইটার ওপর উঠিয়াই একটা নাড়ু মুখে গুঁজিয়া দিল এবং সেটা ভালো করিয়া গলার নিচে যাইবার আগেই ক্ষীরের ছোট বাটিটা নামাইয়া একেবারে চোঁ চোঁ করিয়া চুমুক দিয়া বসিল ; তারপর যখন আর একটুও নাই, বাটিটা নামাইয়া দিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া সেই খালি বাটিটার পানে চাহিয়া ভয়ে আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

এর পরের যা ঘটনা সে সম্বন্ধে গোড়াতেই বলা হইয়াছে।

মিনু সামলাইয়া লইয়াছিল, এমন কি মা-লক্ষ্মী যখন খানই—মার ঠাকুরমার শাশুড়ির সময় একবার খাইয়াছিলেন—তখন একখানা বিস্কুটও পূজার চৌকির সামনে ভাঙিয়া ছড়াইয়া ও চারখানাও তাঁহাব ঘাড়ে চাপাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল মিনু ; কিন্তু টিকিল না কিছুই।

মিনু স্বপ্ন দেখিতেছে—যেন একটা প্রকাণ্ড বাড়ি—তাহার সামনেটা অনেকটা রায় চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপের মত। বড় বড় থাম, আলোয় আলোয় ঝলমল করিতেছে, আর সেই বাড়িতে মা দুর্গা! ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কি কাজ কবিয়া বেড়াইতেছেন ; ওদিকে কার্তিক, এদিকে গণেশ, আলিপুরের চিঁড়িয়াখানার মত ওদিককার একটা দরজা দিয়া সিংহ আসিয়া মা দুর্গার কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল। এমন সময় বাহিরে কোথা হইতে সিঁড়ি দিয়া একটা মেয়ে উঠিয়া আসিল, রেশমের জমজমে শাড়ি পরা, গায়ে এক গা গয়না, মাথায় মুকুট, বাঁ হাতে একটা ঝাঁপি—লক্ষ্মীর ছবিতে যেমন দেখিয়াছে মিনু।

লক্ষ্মীই।

"এই যে, লক্ষ্মী এসেছিস ?"—বলিয়া মা-দুর্গা তাড়াতাড়ি হাতের কাজ ফেলিয়া আগাইয়া গেলেন।

লক্ষ্মীর কিন্তু চোখে আঁচল। মা-দুর্গা কাছে যাইতেই ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন—"এমন বাড়িতে পূজো নিতে পাঠিয়েছিলে মা, শেষে চোর অপবাদ নিয়ে আসতে হোল—ক্ষীর চুরি, নাড়ু চুরি, তার ওপর বিস্কুট পর্যন্ত চুরি !"—

চাকরি

রামধনবাবু বেশ একটু অসহিষ্ণু কণ্ঠেই উত্তর করিলেন—"একে আমি চাকরি বলি না স্যার, আমার পেন্সনের সময় হয়েছে, তাহলে রিটায়ার করিয়ে দিন!"

এই অসহিষ্ণুতার একটু ইতিহাস আছে, আগে না হয় সেইটুকু বলিয়া লই।

আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর রামধনবাবু এই অফিসে চাকরি করিয়া আসিতেছেন। তাহার মধ্যে ওদিককার ষোল বৎসরের কথা বাদ দিলে, বড়বাবুগিরিই হইল আজ চৌদ্দ বৎসর, অর্থাৎ সাহেবের একেবারে শ্যেন দৃষ্টির নিচে থাকিয়া এত বড় অফিসটাকে চালানো, আর, কপালে সাহেবও জুটিয়াছিল একেবারে বাছা বাছা।

প্রথমেই পড়িতে হইল ম্যাকডোনাল্ডের হাতে। খাঁটি স্কচ। রাঙা টকটকে হাঁড়িপানা মুখখানা, এক বর্ণ কথা বুঝিতে পারা যায় না, মনে হয় সমস্ত মুখটায় শুধু কতকগুলো জিভ আছে, নাড়াচাড়া করিয়া একটা হুসহাস শব্দ করিতেছে! নিতান্তই দু'চারটা কথা যাহা বোঝা যাইত, তাহা না বোঝা গেলেই ছিল ভাল। ম্যাকডোনাল্ডের বাপ ছেঁড়া জুতা সেলাই করিত, সেই উত্তরাধিকারে ম্যাকডোনাল্ডের গালাগালটা খুব রপ্ত ছিল, ছোট বড় নির্বিশেষে অফিসের সবাইকে বিতরণ করিত, একটু চটিলেই যেমন পিয়ন, তেমনি বড়বাবু। একটুও কখনও ঠাণ্ডা থাকিতে শেখে নাই বলিয়া অনর্গল স্রোতে অভ্যাসটা থাকিয়া গিয়াছিল—ড্যাম-সোয়াইন, ব্লাডি, স্কাউণ্ড্রেল—আরও কতকগুলা ছিল, বেশি অস্পষ্ট কিন্তু অর্থগৌরবে আরও উঁচু—সেগুলা ওরা হোমেই চালায়, ইণ্ডিয়ায় বড় একটা ছাড়ে না।

প্রথম যেদিন বড়বাবুর পদে উন্নীত হইলেন, সাহেব ঠিক এগারটার সময় ডাকিয়া পাঠাইল, সাড়ে দশটায় অফিস।

উপস্থিত হইতে চেয়ারটা ঘুরাইয়া কটা কটা কুৎকুতে চোখ দুইটা মুখের উপর রাখিয়া গড়গড় করিয়া একরাশ কি বলিয়া গেল। রামধনের এখনও যেন চোখের সামনে ভাসিতেছে, আওয়াজটাও যেন কানে লাগিয়া আছে—একটা টানা হুসহাস ফস-ফস শব্দ—একটা গালাগাল বোঝা গেল, তাহার মধ্যে আর এই রকম একটা প্রশ্ন যে, রামধন এতক্ষণ সাহেবের সামনে আসেন নাই কেন? এটাও যে বুঝিলেন তাহা আন্দাজেই, কেননা আফিসে আসিয়াই সাহেবের সঙ্গে দেখা করিয়া যাওয়া নিয়ম, কিন্তু ভয়ে পা উঠিতেছিল না বলিয়াই সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছে তাঁহার দ্বারা ; ও প্রশ্নটা যে উঠিবেই কতকটা জানা ছিল।

সাহেবের একেবারে মুখোমুখি হইয়া এই প্রথম কথা। এর আগে যখন সেকেণ্ড ক্লার্ক, কোন কাগজপত্র লইয়া তখনকার বড়বাবুর পেছনে পেছনে আসিয়া সাহেবের টেবিলের কাছে আড়াল হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, ব্লাডি-স্কাউণ্ড্রেলের সঙ্গী হিসাবে এক আধটা গালাগাল তাঁহার গায়েও ছিটকাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু এরকম একা দাঁড়াইয়া সব মহড়াটা বুক পাতিয়া লইতে হয় নাই। ওরকম সাহেবের অধীনে এরকম আফিসে যাহারা কাজ করে, তাহাদের সর্বদাই সবরকম জবাবদিহি গড়া থাকে, বিলম্বের জন্য রামধনবাবুও একটা ঠিক করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সাহেবরা রাগী হয় কিন্তু চালাক হয় না, বলিয়া দিলে বোধ হয় কাজ হইত, কিন্তু মুখ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। আর কি বলিয়াছে—একটি গালাগাল ছাড়া আর এক বর্ণ বোঝেন নাই, "ভেরি গুড স্যার"—বলিয়া চারটি ঘন ঘন সেলাম ঠুকিয়া চলিয়া আসিলেন।

কেশিয়ার জয়হরিবাবু টেবিলের অন্য দিকে দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধ লোক, আফিসের ঠাকুরদা, তা ভিন্ন এই সাহেবের কাছেই দুই বছর কাজ

করিয়াছেন, কি বলে অনেকটা আঁচ পান, অফিস থেকে দেরি করিয়াই ফিরিয়া রামধনবাবু সোজা তাঁহার বাসায় গেলেন। খুবই চিন্তিত আর বিষণ্ণ, বলিলেন—"এ ব্যাটার আণ্ডারে তো মান ইজ্জৎ নিয়ে কাজ করা চলবে না মশাই ; কি অর্ডার দিলে, কি বললে কিছুই বুঝতে পারলাম না, একেবারে অত তেরিয়া হয়ে উঠলে কি মানুষের সাড় থাকে, না, বোঝবার দিকে মন থাকে ? তাই ভাবলাম ঠাকুরদার কাছে যাই। আপনি তো শুনলেন, কি কি হুকুম করলে বলুন দেকিন, আটটার সময় আফিস গিয়ে তামিল করে রাখি।"

জয়হরিবাবু বলিলেন—"কাল থেকে ঠিক সাড়ে দশটার সময় গিয়ে হাজরি দেবেন বেটার কাছে, দরকারী কাগজপত্রগুলো নিয়ে।"

"সেটা বুঝেছি, একেবারে যে না বুঝি এমন নয়তো। তারপরে কি ফস্-ফস্ করে বলে গেল ধরতে পারলাম না।"

"আর যা বললে সে ধর্তব্যের মধ্যে নয়—আপনি বাড়ি যান, মুখ হাত-পা ধুয়ে ঠাণ্ডা হোন গে।"

সন্দেহটা বাড়িয়া যাইতে রামধনবাবু আরও ধরিয়া পড়িলেন, শুনিলেন সাহেব বলিয়াছে, বড়বাবুর পদের জন্য তাঁহাকে সুপারিশ করিয়া সাহেবের অনুতাপ হইয়াছে, বলিয়াছে, পরের মেলেই তাঁহাকে একেবারে অফিস থেকে বরখাস্ত করিবার জন্য লণ্ডন অফিসে লিখিয়া পাঠাইবে।

সেই হুঁদে স্কচের কাছে ঝাড়া পাঁচটি বছর কাটাইলেন। যাইবার সময় নিজের ঘড়িটা হাতে দিয়া বলিল—"Her's something to remember me Babu."

ঘড়িটি নারায়ণ শিলার মতো করিয়া সযত্নে তোলা আছে। ছেলে, নাতি, নাতকুড়—সবাই বুঝিবে রামধন লোকটা কে ছিলেন।

২

ইহার পর আসিল হিল্‌টন। এক নম্বর হারামজাদা, খাঁটি ইংরাজ-বেনে, তাহার মূলমন্ত্র হইল খরচ কমানো, আয় বাড়ানো। একটু এদিক ওদিক দেখে, আর খট করিয়া ডিসমিস। আড়াইশত কেরাণী, মাস চারেকের মধ্যে প্রায় শ'দুইয়ে আসিয়া ঠেকিল। কাহার ঘাড়ে যে কোপ পড়িবে কেহ জানে না, অফিসে ত্রাহি ত্রাহি ডাক পড়িয়া গেল। নিতান্ত যখন অচল অবস্থা, রামধনকে গিয়া বলিতে হইল।

হিল্‌টনের অন্য পদ্ধতি, একটু সামনের দিকে মাথাটা ঝুঁকাইয়া একটি একটি করিয়া খুব স্পষ্টভাবে কথা বলে—চোখের ওপর এমনভাবে চোখ পাতিয়া চাহিয়া থাকে যে, মনে হয় সমস্ত শরীর যেন হিম হইয়া গেল। এদিকে কথাগুলাতে আবার একটু বিদ্রূপের ভাবও থাকে মেশানো।

বলিল—"আমার যতদূর স্মরণ হচ্ছে, তুমিই বোধ হয় এই অফিসের বড়বাবু?"

গলা শুকাইয়া গেছে, রামধন ঢোক গিলিয়া বলিলেন—"আমাকেই সে গৌরবের অধিকারী করা হয়েছে হুজুর।"

"এত বড় ভুল কোম্পানি তার সমস্ত কেরিয়ারে আর করে নি। এটা পরের মেলেই লণ্ডন অফিসে লিখে তাদের জানিয়ে দোব আমি।"

চোখের ওপর সেই রকম খট্টাশের মত দৃষ্টি পাতিয়া চাহিয়া রহিল, প্যান্টালুনের মধ্যে রামধনের হাঁটু দুটো আস্তে আস্তে কাঁপিতেছে। একটু পরে সাহেবই প্রশ্ন করিল—"কতদিন বড়বাবু রয়েছ, অনুগ্রহ করে জানাবে কি?"

"আজ্ঞে পাঁচ বছরের কিছু বেশি।"

"পাঁচ বছর চার মাস তের দিন। কিছু বেশি মানে দু'দিন বেশিও হতে পারে। আমার কাছে ফাঁকি চলবে না।"

"আমার মাস চারেক বলার উদ্দেশ্য ছিল, স্যার।"

"তোমার মিথ্যা কথা বলার উদ্দেশ্য ছিল, তোমাদের প্রত্যেক ইণ্ডিয়ানের যা রোগ।"

মুখের ওপর দৃষ্টি ফেলিয়া চাহিয়া রহিল। বোধ হয় একেবারে নিজের ঘাড় থেকে জাতের ঘাড়ে গিয়া পড়ায় একটু হাল্‌কা বোধ হইল, রামধন বলিলেন—"আমাদের ইণ্ডিয়ানদের ও দোষটা আছে স্যার একটু।"

"একটু নয়, যথেষ্ট।"

রামধন চুপ করিয়া থাকাই সমীচীন মনে করিলেন।

"আর যার হাতে যত দায়িত্বের কাজ, সে তত মিথ্যাবাদী।"

উপরো উপরি দুইটা মন্তব্যে নিরুত্তর থাকিতে সাহস হইল না, রামধন বলিলেন,—"সেটা অস্বীকার করা যায় না স্যার।"

"এখন কাজের কথায় আসা যাক—বোধ হয় আশা করতে পারি লোক কমালে—অর্থাৎ বাজে রাবিশ ঝেঁটিয়ে বের করে দিলে অফিসের কাজ কি করে চালাতে হয়, একটা প্রায় ছয় বছরের অভিজ্ঞ বড়বাবু সেটা জানবে ?"

"কাজ আমি বাকি দুশোর মধ্যে চারিয়ে দিয়েছি স্যার, শুধু নিবেদন করতে এসেছি যে আর কমালে—"

সাহেব বাঁ হাত দিয়া থামিতে নির্দেশ করিয়া ড্রয়ার থেকে একটা চিরকুট বাহির করিয়া সামনে রাখিল, বলিল—"এই আরও নয়জনের নাম আমার নোট করা আছে, এরা যাবে। তুমি বড়বাবু, তোমার প্রস্তাব আমার শোনা উচিত, সে হিসেবে আমি একজনের নাম বাদ দিচ্ছি।"

একবার তালিকাটার ওপর চোখ বুলাইয়া মাঝখানে একটা নাম কাটিয়া দিল, মুখের পানে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—"এবার বোধ হয় চালিয়ে নিতে পারবে ?"

আরও আটজন লোক কম !—রামধন ফ্যাল ফ্যাল করিয়া মুখের পানে চাহিয়া রহিলেন।

"পারবে না ? তাহলে ওটাকে আবার ন'জনই করতে হোল বড়বাবু !"

কাটা নামটার পাশে একটা নূতন নাম লিখিয়া চিরকুটটা সামনে সরাইয়া দিয়া বলিল—"এই দেখে নাও।"—রামধন চোখের পাতা নামাইয়া দেখিলেন, ইংরাজীতে লেখা রহিয়াছে—রামধন স্যানিয়াল।

চোখ তুলিয়া দেখেন সাহেব মুখের পানে চাহিয়া আছে, ক্রূর-ব্যঙ্গে ঠোঁটের কোণটা ঈষৎ কুঞ্চিত। ধীরে ধীরে একটু মাথাটাও দুলাইল, তাহার পর প্রশ্ন করিল—"খুব বিপদে পড়লে, নয় কি ? তা আমি তোমার এই সঙ্কটে সাহায্য করতে পারি কি ?"

"সে তো আপনার অশেষ করুণা স্যার।"

হিল্‌টন আর একটা চিরকুট টানিয়া লইয়া খস খস করিয়া খানিকটা লিখিয়া দিয়া কাগজটা আবার সামনে ঠেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে সশব্দে চেয়ার ঠেলিয়া দিয়া র‍্যাক থেকে হ্যাট আর ছড়িটা লইয়া শিস্ দিতে দিতে বাহির হইয়া গেল! রামধন পড়িলেন—'কোম্পানির দুঃসময় যাইতেছে, সেইহেতু দ্বিতীয় হুকুম না হওয়া পর্যন্ত অফিসের কার্যকাল এক ঘণ্টা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। প্রয়োজন হইলে ঊর্ধ্বতন কর্মচারিরা আরও বেশিক্ষণ থাকিয়া কাজ সামলাইয়া লইবে।'

৩

অত বড় কুচুটে বদমাইস সাহেব আর আসে নাই অফিসে। তিন বৎসর পরে, প্রাণ যখন কণ্ঠাগত সবার, বিদায় লইল। তাহারও একটা নিদর্শন আছে বৈঠকখানায় ফ্রেমে বাঁধানো একটা ভালো সার্টিফিকেট, ভাবী বংশধরেরা বড় গলা করিয়া পরিচয় দিবে।

ইহার পর আসিল ও'কনোর, একজন আইরিশ। লোকটা আসিয়াই যেভাবে অফিসের সময়টা আবার কমাইয়া দিল তাহাতে একটু আশা হইল, বোধ হয় সুদিন ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু অচিরেই দেখা গেল ওটা করিয়াছে ওদের জাতিগত ইংরাজ-বিদ্বেষের জন্য, কর্মচারীদের প্রতি অনুকম্পায় নয়। ঐ যে হিল্‌টন ওটা করিয়া গেছে, সুতরাং ওর নাকচ করা চাই। হিল্‌টন যে অতগুলা কেরাণীকে ছাড়াইয়া গেছে, তুই যেমন সময় কমাইয়া দিলি, তাহাদের ফিরাইয়া আন—সেদিক দিয়াও গেল না। এদিকে লণ্ডন অফিসকে ভয় আছে, তাহাদের কাজ চাই, নিজের কক্ষ ছাড়িয়া কেরাণীদের ডেস্কে ডেস্কে ঘুরিয়া তাগাদা দিয়া যেন উদ্বাস্ত করিয়া তুলিল। তাহার নিজের কাজ গিয়া পড়িল রামধনবাবুর ঘাড়ে, রাত্রি পর্যন্ত বাতি জ্বালিয়া কাজ করিতে করিতে দম ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। ইহার পর খিঁচুনি বকুনি তো আছেই—ওটা সাদা চামড়ারই ধর্ম, স্কচ হোক, ইংরাজ হোক, আইরিশ, হোক, ইতর-বিশেষ হয় না।

কি যে শেষ পর্যন্ত দাঁড়াইত কিছুই বলা যায় না, তবে দিন দশেকের মধ্যে সবাইকে নাকানি-চোবানি খাওয়াইয়া আফিসে ছোটখাট একটি বিপ্লব বাধাইয়া ও'কনোর হঠাৎ একদিন হার্টফেল করিয়া মারা গেল। সমস্ত অফিসের লোক ওর কবরে গিয়া মালা দিয়া আসিল, অনেকে স্পষ্টই ব্যক্ত করিল মনের ভাবটা—'স্বচক্ষে দেখে আসি মশাই, বিশ্বাস নেই।'

ও'কনোরের পর আসিল ম্যাকলীন। লোকটা বর্ণশঙ্কর,—বাপ স্কচ, মা—কেহ বলিল আইরিশ, কেহ বলিল ইংরাজ। একটা সাহেবের মধ্যে যা' দোষের কিছু হইতে পারে সবগুলা আছে ম্যাকনীলের রক্তের মধ্যে। গোঁয়ার, রগচটা, এদিকে কথা অত্যন্ত অস্পষ্ট অথচ হুকুম অনুযায়ী কাজ না হইয়া যদি একচুল এদিক ওদিক হয় তো দারুণ অনর্থ। ইহার উপর এক একদিন যখন বেহেড মাতাল হইয়া অফিসে প্রবেশ করে, কোন্

দিকে মতি গতি যাইবে, কি করিবে কিছুই বোঝা যায় না, সমস্ত অফিস সন্ত্রস্ত হইয়া থাকে।

হয়তো রামধনবাবুকেই মদ খাইবার জন্য ধরিয়া পড়িল। মদের মুখেও ফিচলেমি যায় না, আরম্ভ করে খুব সূক্ষ্মভাবে। রামধন কাগজপত্র দস্তখত করাইতে গেছেন—অবশ্য ডাকার ওপর—বোতল থেকে টম্‌ব্লারে মদ ঢালিয়া তাঁহার সামনে টেবিলের ওপর সেটা বসাইয়া দিয়া নিঃশব্দে মাথা গুঁজিয়া দস্তখৎ করিতে লাগিল। শেষ হইলে গেলাসটার দিকে একবার চাহিয়া লইয়া রামধনবাবুর মুখের পানে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া দারুণ বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল—"তুমি খাও নি, না, সেটা শেষ করে আর এক গ্লাস ঢেলে নিয়েছ?—তাহলে হাত বাড়াও শেকহ্যাণ্ড করি।" দুইদিকেই বিপদ, যে উত্তরটা আগে আসে মুখে সেইটাই দিয়া দেন—

"না, আমি খাই না, আপনি তো জানেন স্যার।"

"জানি!—তাহলে তোমায় অফার্ করব কেন এ-ভাবে অপমানিত হবার জন্যে?"—হঠাৎ রাগে টলমলে মাথাটা সোজা করিবার চেষ্টা করিয়া মুখের পানে চাহিয়া থাকে।

"তাহলে বোধ হয় জানতেন না স্যার।"

"বোধ হয়! বোধ হয় মানে কি?"

"তাহলে নিশ্চয় জানতেন না হুজুর?"

মাথাটা বোধ হয় এদিকে আর খেলে না, সাহেব টেবিলের ওপর দৃষ্টি নত করিয়া টলিতে থাকে, প্রশ্ন জোগাইতেছে না বলিয়া রাগে মুখটা ক্রমশঃ আরও রাঙা হইয়া উঠিতে থাকে, এক সময় প্রশ্ন করে—

"কেন খাও না? খাওয়াটা দোষ?"

সমস্ত গেলাসটা একচুমুকে নিঃশেষ করিয়া সেটা সশব্দে টেবিলে বসাইয়া মুখের পানে চায়, প্রশ্নটার পুনরুক্তি করে—"খাওয়াটা দোষ, না পাপ?"

"না, দোষ পাপ মোটেই নয় হুজুর, সব বড় লোকেরাই যখন খান—"

"তাহলে?—আমি আশা করেছিলাম তুমি আমায় পাপী বলবে—বলতে সাহস করবে, আর তার জন্যে তোয়ের ছিলাম—"

টেবিলে এমন একটা ঘুষি মারে যে গেলাসটা পড়ে উল্টাইয়া।

বোতলটা বাঁ হাতে মুঠাইয়া, বুকটা টেবিলে চাপিয়া প্রশ্ন করে—"তাহলে?—আমি যা কবি তা করবে না কেন?—এ অপমান কিসের জন্যে?—কিসের জন্যে?—আমি জানতে চাই, কিসের?"

নেহাৎ পরমায়ু আছে রামধনের, জোগাইয়া যায়—"ডাক্তারে বারণ করেছে স্যার, লিভারের দোষ আছে।"

সাহেবের দৃষ্টি হঠাৎ নরম হইয়া যায়, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া থাকে। মদটা মাথায় চনচন করিয়া উঠিতেছে, একটা সমীচীন উত্তরের উপর কি করা উচিত মাথায় আসে না। টেবিলের উপর দৃষ্টি নত করিয়া আবার ভাবিতে থাকে।

একটা সুযোগ, রামধন সাহস সঞ্চয় করিয়া ধীরে ধীরে প্রশ্ন করিতে যান—"কাগজগুলো তাহলে এখন নিয়ে যেতে— ?"

"হ্যাঁ, খুব পার—যদি সাহস থাকে তো— !!"

উৎকট গর্জনের সঙ্গে চেয়ারটি পেছনে চার হাত ঠেলিয়া ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়ায়।

সবদিন দৃশ্যটা যে একই ধরণের হয় এমন নয়, তবে নাটকের পরিণামটা হয় প্রায় একই।

অফিসের যত কেরাণী পা টিপিয়া টিপিয়া সাহেবের ঘরের দরজার বাহিরে ভীড় করিয়া কান পাতিয়া দাঁড়ায়। রামধনের কথাগুলা যত হয় যুক্তিপূর্ণ, উত্তরের অভাবে সাহেবের মেজাজ তত যায় ভিতরে ভিতরে বিগড়াইয়া, তাহার পর যে কোন একটা সামান্য কথার ওপর যখন ঐভাবে আসবাবপত্র ছড়াইয়া গর্জাইয়া ওঠে, দোরের ওদিকে সেই চাপ ভিড় ছত্রভঙ্গ

হইয়া যে যার নিজের জায়গা লক্ষ্য করিয়া ছোটে, চেয়ার ছিটকাইয়া পড়ে, টেবিল ওল্‌টাইয়া যায়, ফাইলগুলা ছত্রাকার, দোয়াত-কালি কলমের কোন হিসাব নাই।

"হোয়াটস-দ্যাট !"—বলিয়া সাহেব যখন দরজা ঠেলিয়া বাহিরে আসিয়া দাঁড়ায়, সমস্ত অফিসটা যেন একটা পটে আঁকা ছবি,—কেহ চেয়ারটা

কুড়াইয়া আনিতে আনিতে থামিয়া গেছে, কোথাও দুইজনে মিলিয়া টেবিলটা তুলিয়া দাঁড় করাইতে করাইতে—কেহ ফাইলের কাগজগুলা পাখার হাওয়ার মধ্যে একত্র করিবার চেষ্টা করিতেছিল, প্রস্তরবৎ নিশ্চল হইয়া গেছে, কেহ চেয়ারের অভাবে তাড়াতাড়ি টেবিলে বসিয়াই লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল, আর কলম চালাইতে পারিতেছে না।

টলিতে টলিতে খানিকক্ষণ ধরিয়া ব্যাপারটা দেখিয়া কখনও হয় তো হুঁস হয় সাহেবের; কখনও আরও বেহুঁস হইয়া পড়ে। এই ধ্বংসস্তূপের ওপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া, যেটুকু শৃঙ্খলা থাকে সেটুকু পর্যন্ত নষ্ট করিয়া নিজের কামরায় গিয়া গেলাসে দেয় ডুব।

ম্যাকনীলের অধীনেও দেড় বছর কাজ করেন রামধন। বাকি দুইটা মাসও নিশ্চয় করিতেন, কিন্তু একদিন ঐ রকম অভিনয়ের মধ্যেই নিজের চেয়ারটাকে আছড়াইয়া আশ না মেটায়, বোধহয় নিজের টেবিলের পায়া লক্ষ্য করিয়া বুটসুদ্ধ প্রচণ্ড লাথি চালাইল, তাহার শেষের ঝোঁকটা পড়িল রামধনবাবুর বাঁ পায়ের গুলফে। একটা ছোট গোছের চাক্‌লা উঠিয়া গেল।

চৌদ্দ বৎসরের একটানা সুখের চাকরি, ডায়বিটিশ অসুখ ধরিয়া গিয়াছিল, রামধন বিছানা লইলেন।

৪

গোড়াতেই যে সহিষ্ণু আলাপের উল্লেখ করা হইয়াছে সেটা আট মাস পরের কথা। রামধন মাস ছয়েক ভুগিয়া, তাহার পর মাস দুয়েক সুস্থ-সমর্থ হইয়া আবার অফিস জয়েন করিয়াছেন। নূতন ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা হইতেছিল।

এই আট মাসে কিন্তু অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। দেশের

শাসনভার হাতফের হইয়া নিজেদের হাতে আসিয়াছে। বিলাতী কোম্পানিগুলি টলমলায়মান, কোনরকমে গড়াইয়া গড়াইয়া ছোট মাঝারি সাইজের কতকগুলি ফার্ম শেষ পর্যন্ত ভারতীয়দের হাতে নিজেদের স্বত্ব বিক্রয় করিয়া এদেশ থেকে পাত্তাড়ি গুটাইল। রামধনবাবুদের অফিস একজন বাঙালীর হাতে গিয়া পড়িয়াছে। পূর্ববঙ্গের এক বেশ বড় পুরাতন জমিদার বংশ। স্বত্বাধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিখিলেশ রায়, ম্যানেজিং ডিরেক্টার। আজ তিন মাস হইতে কাজ চলিতেছে, রামধন সুস্থ হইয়া উঠিলে উহাদের অনুরোধে আবার নিজের চেয়ারে আসিয়া বসিয়াছেন।

নিখিলেশের বয়স সাঁইত্রিশ আটত্রিশ এই রকম, অর্থাৎ চল্লিশের মধ্যেই। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভালো ছাত্র, এম-এতে অর্থনীতিশাস্ত্রে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

প্রথম যেদিন রামধন আবার কাজ শুরু করিলেন, নিখিলেশ আফিস হলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিয়া বেড়াইতেছিলেন, একটু পরেই আসিয়া তাঁহার টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া নমস্কার করিলেন।

এই প্রথম দেখা, চেনা নাই, রামধন প্রতিনমস্কার করিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি দরকার আপনার ?"

নিখিলেশ একটু হাসিয়া বলিলেন—"একটু আমার ঘরে আসুন দয়া করে।"

রামধন বুঝিলেন। সাহেবী যুগের অভ্যাসে একেবারে ধড়মড়িয়া বিশৃঙ্খলভাবে উঠিয়া যেমন-তেমন করিয়া জুতা পরিতে পরিতে পা বাড়াইলেন। নিখিলেশ বলিলেন—"আপনি ধীরে সুস্থে আসুন, অসুস্থই বলতে হবে তো এখনও, আমি এগুচ্ছি!"

ঘরটার চেহারা বদলাইয়াছে। আর সবের মধ্যে দেয়ালে একখানি গান্ধীজী আর একখানি নেতাজীর বড় তৈলচিত্র ; যেখানে ম্যাকলীনের

মদের বোতল থাকিত সেখানে টাটকা ফুলে ভরা একটা বড় নীল কাচের ফুলদানি।

বড়বাবু গিয়া উপস্থিত হইলে একটা চেয়ার দেখাইয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন এবং বসিলে আগে শরীরে কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, সুকৌশলে রোগের একেবারে গোড়ার কথাটা এড়াইয়া তারপর আফিস সংক্রান্তও কিছু কথা হইল। রামধন উঠিবার সময় বলিলেন—"এখন দিন-কতক আপনি সুবিধে মতোই যাওয়া-আসা করবেন, অসুস্থই বলতে হবে তো ; কাজ এক রকম চলে যাচ্ছে।"

—এক রকম নয়, এত সুশৃঙ্খলার সঙ্গে কাজ যে চলিতে পারে, আজ প্রায় ত্রিশ বৎসরের অভিজ্ঞতার মধ্যে সে ধারণা কখনও গড়িয়ে উঠিতে পারে নাই রামধনের। ক্রমে ক্রমে বুঝিলেন, এই কয়েক দিনের মধ্যেই অফিসের সব কিছুই নিখিলেশের নখদর্পণে আসিয়ে গেছে। একে ভালো ছাত্র, তায় নিজে অসম্ভব খাটেনও।

সবই ভালো, অখণ্ড শান্তির মধ্যে কাজ, পুরাতন কর্মচারী হিসাবে শ্রদ্ধা খাতির এত বেশি যে, মনে হয় তিনিই যেন ম্যানেজিং ডিরেক্টর বা আর ওপরের কেহ ; তবুও যত দিন যাইতে লাগিল রামধন যেন ভিতরে ভিতরে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতে লাগিলেন। কি কারণ ? সেইটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে রামধনের নিজের স্বভাবও বদলাইয়া আসিতে লাগিল একটু একটু করিয়া।

নিজের অফিসেও ঘুণ হইয়া অফিসটাকে নিজের মুঠার মধ্যে রাখিবার অভিসন্ধি আছে কি নিখিলেশের ?—দেখা গেল একেবারেই নয়, সবাই নিজের নিজের আসন-অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত।—কাজ হালকা করিয়া লোক কমাইবার মতলব ? মোটেই নয়, হিল্‌টন যাহাদের তাড়াইয়াছিল তাদের মধ্যে এতদিনেও যাহারা সুবিধা করিতে পারে নাই, তাহাদের ডাকিয়া লওয়া হইয়াছে।—তা হোক, তবুও ভিতরের একটা অস্পষ্ট

অশান্তিতে মনটা খুঁৎখুঁতে হইয়া উঠিল রামধনের। এতদিন এত বিপদের মধ্যে যে রামধন সব কেরাণীদের আগলাইয়া আসিতেছিলেন সাধ্যমত, তিনিই যেন ধীরে ধীরে সবার বৈরী হইয়া উঠিতে লাগিলেন। একদিন দুইজন পুরাতন কেরাণীর পুনর্নিয়োগে অযথাই গিয়া মৃদু অনুযোগ করিলেন—"বেশ তো কাজ চলছিলই—এটা কোম্পানীর বাজে খরচের মধ্যেই পড়বে তো?"

নিখিলেশ একটু হাসিয়া বলিলেন—"একটু ক্ষতি হবেই রামধনবাবু খুব খতিয়ে দেখতে গেলে, কিন্তু জন পঞ্চাশেক যে লোকটা ছাড়িয়েছিল, তার মাত্র একুশ জন আমরা নিয়েছি, তার মানে এখনও যথেষ্ট চাপ রয়েছে সবার ঘাড়ে।"

"কিন্তু কেউ তো গ্রাম্বল্ করছে না।"

"তার কারণ একটু ভালো ব্যবহার পাচ্ছে আগেকার চেয়ে, তা ভিন্ন নতুন স্বাধীনতা এসেছে, বাঙালীর ফার্ম বলেই সবাই বোধ হয় অনুভব করে অনেকটা নিজেদেরই জিনিষ—সেই ভাবটাই বাড়াই না আমরা, ফল ভালোই হবে—"

ভালো কথাই, কিন্তু মনের গভীর রহস্যের কথা কে বুঝিবে?—যে টেবিলের সামনে দাঁড়াইয়া মাতালের মুখে ড্যাম-স্কাউণ্ড্রেল শুনিতে অভ্যস্ত, সেই টেবিলের সামনে চেয়ারে বসিয়া রামধন কথাগুলা শুনিয়া ভিতরে ভিতরে জ্বলিতে লাগিলেন, অবশ্য ওপরে শুধু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"অর্থাৎ যাকে বলে মামার বাড়ি—"

সেই দিন এই পর্যন্ত রহিল। কিন্তু জমিতে লাগিল। কারণ কিছু নাই, শুধু বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে, বুটের নিচে থাকিয়া যে শৃঙ্খলা যে শান্তির জন্য প্রাণপাত করিতেন—বিনিদ্র রজনী দুশ্চিন্তায় কাটাইয়া আলো জ্বালিয়া অফিস করিয়া তবুও যাহা আয়ত্ত হয় নাই, অনায়াসলব্ধ সেই শান্তি শৃঙ্খলা যেন বিষ হইয়া উঠিতে লাগিল।—ঝোঁকটা নিরীহ

কেরাণীদের ওপর গিয়া পড়িল, ক্রমে সেটা মৃদু অত্যাচারে গিয়া দাঁড়াইল।

সেই লইয়াই একদিন কথা। নিখিলেশ যত বুঝাইতে চান, রামধন ততই ভিতরে ভিতরে উত্যক্ত হইয়া ওঠেন, ওদিকে যুক্তি যতই সমীচীন, যতই অকাট্য, এদিকে ততই জ্বালা। আক্রোশ যায় না দেখিয়া নিখিলেশ কতকটা এ্যাপীলের মতো করিয়াই বলিলেন—"রামধনবাবু, চাকরি তো আমাদেরও করতে হচ্ছে, না হয় ওপরেই, বুঝতেই তো পাচ্ছি যে মনে শান্তি না থাকলে—"

ম্যাকনীলের মতোই দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন রামধন, বলিলেন—"একে আমি চাকরি বলি না স্যার, আমার পেন্সনের সময় হয়েছে, তাহলে রিটায়ার করিয়ে দিন। আমি বড় বড় সায়েবের আণ্ডারে কাজ করেছি, আমার ট্রেণিং অন্যরকম, চাকরির ধারণাও আমার অন্যরকম—সে বিষয়ে আমায় অন্য কারুর কাছে শিক্ষা নিতে হবে না।"

—নিজে ইস্তাফা দিয়া রিটায়ারই করিলেন।

মকদ্দমার দলিলপত্র দেখিয়া রায়সাহেব একটু চিন্তিতভাবেই মাথা দুলাইয়া অভিমত দিলেন, "হুঁ—কেসটা কিন্তু বড় দুর্বল সারদাবাবু, রফা করে নিলেই ভাল হোত।"

রায়সাহেব অপরেশ সান্যাল দেওয়ানী সাইডে শহরের সবচেয়ে বড় উকীল। সারদাবাবু ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, বলিলেন—"আমি চেষ্টা করেছিলুম রায়সাহেব। চোরাবাজারে ফেঁপে উঠে ও ধরাটাকে সরা দেখছে জানি বৃথা হবে, তবু গিয়ে বললাম অনেক করে, শুনলে না। আমি এগুতুমও না, তবে চেষ্টা না করে উপায় নেই। জমিটা পেলে ওর হদ্দ খান দুয়েক ঘর বাড়বে, ওপর নিচেয়, আমার কিন্তু মান ইজ্জৎ নিয়ে থাকা দায় হবে। হঠাৎ বড়লোক, তায় কাঁচা পয়সা, এর বেশি আর কি বলব আপনাকে?—আপনাদের মত বনেদী ঘর তো নয়—"

রায়সাহেব একটু স্মিত হাসিয়া বলিলেন—"সব তো বুঝছি, কিন্তু—এই রকম একটা উইক কেস্ নিয়ে—"

সারদাবাবু হাত ধরিয়া ফেলিলেন—"নিন কেসটা দয়া করে, অনেক উইক স্ট্রং হয়ে গেছে আপনার হাতে, এই শহরেরই লোক আমি, জানি তো। আমার সাধ্যি নয় আপনাকে এন্‌গেজ করা, তবুও আপনার দ্বারস্থ যে হয়েছি সে শুধু ওর হাত থেকে আপনাকে কেড়ে রাখবার জন্যে। আপনি নিন তো কেসটা—তারপর আমার অদেষ্ট, হেরে যান, মনে করবেন—একটা ভদ্রপরিবারের ইজ্জৎ বাঁচাবার জন্যে একটু অপযশ নিলেন নিজের ওপর—জেনে শুনেই।"

রায়সাহেব একটু চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন—"ধরুন না হয় নিলুম, কিন্তু ফলটা কি হচ্ছে ? লোয়ার কোর্টে আপনি হেরেছেন এখানকার এ্যাপীলে যদি জিতেই যান, ও হাইকোর্ট পর্যন্ত যাবে, টাকার জোর আছে, সেখানে তো আপনি ওর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবেন না—"

সারদাবাবু বলিলেন—"ও যাবে না হাইকোর্টে, ভেতরকার এ খবরটা আমি টের পেয়েই এসেছি ; চোরাবাজারে ওর এখন ভয়ানক মরশুম চলছে, ওর এখান থেকে নড়লে চলবে না, চারদিকে ঘুষ-ঘাষ খাইয়ে সামলে-সুমলে চলা তো। আমি ঐটুকু জানতে পেরেই করে দিলাম এ্যাপীলটা রায়সাহেব, নৈলে ডুবেই ছিলাম, ডুবতাম।"

রায়সাহেব বোধ হয় গা-ঝাড়া দিবার জন্য আর একটু চিন্তা করিলেন, যুক্তিসঙ্গত আর কিছু হাতের কাছে না পাওয়ায় একটু হাসিয়া বলিলেন—"নেহাৎই ছাড়বেন না ?—তা বেশ।"

সারদাবাবু চলিয়া যাওয়ার একটু পরে গাড়ি-বারান্দায় একটি নূতন মডেলের মোটরকার আসিয়া দাঁড়াইল এবং অচলবাবু ধীরে সুস্থে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনিই সারদাবাবুর প্রতিপক্ষ। প্রাথমিক শিষ্টভাষণাদির পর জানাইলেন—কেসটি তাঁহাকে গ্রহণ করিতে হইবে।

রায়সাহেব একটু আগের কথা বলিলেন, অপরপক্ষ তাঁহাকে পূর্বেই এন্‌গেজ করিয়া গেছে, তিনি নিরুপায়।

অচলবাবু একটু মৃদু হাসিয়া বলিলেন—"এ আর শক্ত কথা কি রায়-সাহেব ? সারদাবাবুর এ্যাপীলের শখটা আমি মেটাব, আপনাকে চাই আমার, খরচে আমি পেছ-পা নই।"

রায়সাহেব মিষ্টভাষী লোক, তবে প্রয়োজন হইলে ভাষাটাকে দিয়া মিষ্ট পাদুকারও কাজ নেন, হাসিয়াই বলিলেন—"অর্থাৎ কি দু'গুণ, চার গুণ—যা চাই ; কথাটা আপনার উপযুক্ত হয়েছে অচলবাবু, তবে আদালতের একেবারে মাঝখানে বসে ব্ল্যাক মার্কেটিং করতে সাহস হয় না।"

যুগধর্ম লইয়া নিতান্ত একটা সাদা পরিহাস, নিজেও সেইভাবেই হাসিয়া উঠিলেন, অচলবাবুও হাসিতে হাসিতেই বিদায় লইলেন, তাহার পর মুখখানি কালো করিয়া গাড়িতে বসিলেন।

২

সাব-জজ বামাচরণবাবুর এজলাসে কেস উঠিয়াছে, তারিখও পড়িয়াছে। কেস হিসাবে বিশেষ বড় নয়, তবে জেদাজেদির ব্যাপার, শহরে বেশ একটু চাঞ্চল্যও পড়িয়া গেছে।

তারিখের দিন চার আগে সন্ধ্যার সময় সারদাবাবু বেশ একটু বিষণ্ণ-ভাবে বৈঠকখানায় ফরাসের এক ধারটিতে আসিয়া বসিলেন। মাঝখানটিতে দাবাখেলা চলিতেছিল, রায়সাহেব একবার চোখ তুলিয়া দেখিয়া আবার তাহাতে নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। শেষ হইলে খানিকটা গল্পগুজব করিয়া সবাই উঠিয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—"তারপর, সারদাবাবু যে? মনমরা ভাব, নতুন কিছু খবর আছে নাকি?"

সারদাবাবু উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে, আছে একটু, তাই অসময়ে ছুটে আসতে হল—"

চাকর গড়াগড়ায় নূতন করিয়া ছিলিম বসাইয়া দিয়া গেল, রায়সাহেব গির্দায় হেলান দিয়া সট্‌কাটা তুলিয়া লইয়া বলিলেন—"তাই নাকি? শুনতে হচ্ছে তো—"

"অচলবাবু একটা মস্ত বড় চাল দিয়েছেন। শুনলাম, বোগ্‌ড়ো থেকে বামাচরণবাবুর মামাকে নিয়ে আসছেন। তিনি ওখানকার পুরনো উকীল, এদিকে রায়বাহাদুর। ভেতরে ভেতরে খবর নিয়ে যতটা বুঝলুম উকীল যে খুব ভালো তা নয়, তবে সদরালা সাহেবের একেবারে মামা।—অচলবাবু অবশ্য সেটা প্রকাশ করে নি, আমিই খোঁজ নিয়ে জানলাম,

বলি, ভালো রে ভালো, এত দেশ থাকতে হঠাৎ বোগ্‌ড়ো ছুটল কেন লোকটা।"

রায়সাহেব গড়গড়া টানিতে লাগিলেন। মুখটা একটু ভার; বলিলেন—"রায়সাহেব না পেয়ে রায়বাহাদুর?"

সারদাবাবু সুযোগটা হাতছাড়া করিলেন না, বলিলেন—"তা আনছে আনুক, সবাই আনে, কিন্তু যেমনভাবে গেয়ে বেড়াচ্ছে, সেইটেই হয়েছে শ্রুতিকটু কিনা—"

"গালমন্দ দিয়ে বেড়াচ্ছে নাকি?"

"সোজা গালমন্দ তো ভাল রায়সাহেব; কিন্তু চোরাকারবারী লোক, ওপ্‌ন্ মার্কেটে বেচাকেনা করে না তো, সোজা গালাগাল দেবার হিম্মৎ কোথায়? তাহলে আপনাকেই তো সেদিন মুখের উপর শুনিয়ে দিতে পারত, শুনেছি তো থাপ্পড়টা কি রকম খেয়েছিল আপনার কাছে সেদিন এন্‌গেজ করতে এসে। এখন এখানে-ওখানে আড়ালে বলে বেড়াচ্ছে, রায়সাহেবের ওপর রায়বাহাদুর চাপিয়েছি, দেখি কি করে সামলায়! আপনার কানে উঠছে না, আমাদের কানে বিষ ঢালছে—"

রায়সাহেব চুপ করিয়া গড়গড়া টানিয়া যাইতে লাগিলেন। সারদা-বাবুও চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন, কথাগুলি মনে বেশ থিতাইয়া বসুক, শুধু চোখের কোণে এক একবার দৃষ্টিপাত করিয়া যাইতে লাগিলেন, তাহার পর এক সময় বলিলেন—"মরুক গে, সে ভয় করি না, আমাদের রায়সাহেবের সঙ্গে বোগ্‌ড়োর উইয়ে-ধরা রায়বাহাদুরের লড়াইটা না হয় দেখাই যেত একবার; কিন্তু তাতো হচ্ছে না, ভেতরের চালটা যে মস্ত বড় দিয়েছে। সদরালা সাহেব সম্বন্ধে তো জানেনই সব কথা—"

রায়সাহেব একটু চকিত হইয়াই প্রশ্ন করিলেন—"মামার হাত দিয়ে খাবে নাকি? কৈ, এসব দোষের কথা শুনি নি তো—"

"আজ্ঞে না, ওসব দোষ নেই। কিন্তু কথা হচ্ছে ভয়ঙ্কর মাতৃভক্ত

মানুষ, প্রণাম করে কোর্টে যান, ফিরে এসে প্রণাম করে ঘরে ঢোকেন। গুণই তো, খুব বড় গুণ। অত বয়সেও ছেলে বাধ্য, আর অমন ছেলে—কিন্তু আমাদের কপাল দোষে এ ক্ষেত্রে যে দোষে দাঁড়াচ্ছে। মা যদি আবার বড় ভাইয়ের ঐরকম বাধ্য হন,—না হবার কারণ তো কিছু নেই—তাহলে রেজাল্টটা যা দাঁড়াবে, বুঝতেই তো পারেন, আর তাই জেনেই তো তাকে কাঁধে করে নিয়ে আসা অত দূর থেকে।"

এবারে মুখ থেকে সট্‌কাটা সরাইতে অনেকক্ষণ দেরি হইল, রায়সাহেব খুব গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। সারদাবাবু মনে মনে পুলকিত হইয়া উঠিলেন, মকদ্দমাটায় বিশেষ কিছু নাই, যাহাতে ও-পক্ষে না যান শুধু সেই জন্য জোর করিয়া গছাইয়া দেওয়া তাঁহাকে। এতদিন হাঁটাহাঁটি করিয়াও রায়সাহেবকে বিশেষ অবহিত করিতে পারেন নাই, এখন এই নূতন ব্যাপারটিতে তাঁহাকে যেমন একটু খোসামোদ করিবার সুযোগ পাওয়া গেল, তেমনি উত্তেজিত করিবারও। সফল হইবার লক্ষণ দেখিয়া তিনিও নীরবেই অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একটু পরে একটা দীর্ঘ টানের সঙ্গে "হুঁ!"—শব্দ করিয়া সারদা-বাবুর দিকে মুখ ফিরাইলেন রায়সাহেব। বলিলেন—"যতই ভাবছি, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, অচলবাবু নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারলে। ব্যাপারটা আমাদেরই ফেবারে যাবে। আর কিছু না হোক মানুষের একটা সহজ সম্ভ্রমজ্ঞান আছে তো। মামা এজ্‌লাসে এল আর মকদ্দমা জিতে নিয়ে গেল, এটা এক দৃষ্টিকটু ব্যাপার—ব্রড্ ডে লাইটে—তারও পর যে রকম শুনছি আপনার কাছে, লোকটা একটু ধর্মপ্রবণ—বিবেক বলে একটা জিনিষ আছে। আচ্ছা, দাঁড়ান, আর একটু ভাবি।"

আরও খানিকক্ষণ গড়গড়া টানিয়া বলিলেন—"অবশ্য এরকম যে না হচ্ছে তা নয়, মানুষের অনেক রকম দুর্বলতাই আছে তো, হয়তো এদিকে ধার্মিকই, অথচ আত্মীয়স্বজন ফাঁকতালে কিছু পেয়ে গেলে সেটা অপছন্দ

নয়। আমাদেরই অনেকেরই তো সাধুতার আইডিয়া—নিজের হাত পেতে না নেওয়া—ধূর্ত মক্কেলে তার সুযোগটুকু নিতে ছাড়ে না—"

সারদাবাবু হাসিয়া বলিলেন—"আর মার অবাধ্য হওয়াটা বেশি পাপ, কি মার বাধ্য হয়ে অপরের সর্বনাশ করাটা বেশি পাপ—এটা ঠিক করাও তো অনেকের পক্ষে শক্ত—"

রায়সাহেবও একটু হাসিলেন বলিলেন—"তা বৈ কি।—আপনি এক কাজ করুন সারদাবাবু। সত্যি দুনিয়ার যেমন হালচাল দেখি—ধর্মটা কিছু নয়, অনেকের পক্ষে একটা অভ্যাস। সদরালা সাহেব লোকটা কি রকম জানি না, নতুন এসেছে ; ওর কোর্টে যাবারও বড় একটা দরকার পড়ে নি এ পর্যন্ত। আপনি খবর যোগাড় করতে যেমন ধুরন্ধর দেখছি, একটু সন্ধান নিন তো ওঁর এ উইক্‌নেসটা আছে কিনা—এই মামা, খুড়ো, পিসে এসে দাঁড়ালে কেস্ জিতেয়ে দেওয়া—ভেবে দেখে মনে হচ্ছে যেন আছে, নৈলে অচলবাবুই বা এরকম করতে যাবে কেন? ঝানু লোক বোঝে তো সেরকম মানুষ হলে কেস্ এতে কেঁচে যাওয়ারই কথা।"

সারদাবাবু বাহির হইয়া গেলে চাকরকে দিয়া রাস্তা হইতে আবার ডাকিয়া পাঠাইলেন, উপস্থিত হইলে বলিলেন,—"হ্যাঁ, আর এক কথা, সদরালা সাহেবের পরিবার, আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধেও একটু খোঁজ নিন—কে কোথায় থাকে, কি কি কাজ করে, এদিকে বাড়িতে কে কে আছে। কাল পর্যন্ত কিন্তু সব খবরটুকু পেয়ে যাওয়া চাই, সময় নেই আর।"

অত বিলম্ব হইল না। সেই দিনই সন্ধ্যার সময় দাবা পড়িবার আগেই সারদাবাবু সব খবর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলেন। সদরালা সাহেবরা তিন ভাই—এক ভাই ডেপুটি, থাকেন খুলনায়, এক ভাই ঢাকায় প্রফেসার। দুই বোন; এক বোন বিধবা, এক ভগ্নীপতি আবগারী বিভাগে কি একটা বড় চাকরি করেন। এদিকে সদরালা সাহেবের নিজের দুই বিবাহ—

রায়সাহেব সোজা হইয়া বসিলেন, কতকটা কৌতুকমিশ্রিত উল্লাসের সহিতই বাধা দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"দুই্ বিয়ে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"বেশ, তারপর?"—গড়াগড়ার টানটা দ্রুত হইয়া উঠিল।

"এক বিবাহে ক্রমাগত মেয়ে হোতে লাগল, বংশ থাকে না, তাই বছর তিনেক হল দ্বিতীয় দারপরিগ্রহ করেছেন—"

"হয়েছে বংশ-রক্ষা?—এ পক্ষ এখন কোথায়?"—প্রশ্নগুলা যেন হুড়াহুড়ি করিয়া বাহির হইয়া আসিতে চায়।

সারদাবাবু এ ভাবান্তরে একটু যেন বিমূঢ়ভাবেই উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে হ্যাঁ, একটি পুত্রসন্তান হয়েছে, দুই স্ত্রী-ই এখানে, এ পর্যন্ত খবর পেলাম দুজনের মধ্যে বেশ বনিবনাও—"

রায়সাহেব হাতের সট্কাটা নামাইয়া বিরক্তভাবে ফরাসের ওপর চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন—"চুলোয় যাক বনিবনাও, ওদের বাপের বাড়ির খবর বলুন আগে মশাই, এখানে দুজনে গলায় গলায় হলেই বা আমার কি, ঝেঁাটাঝুঁটি করে মলেই বা আমার কি?—বলি, ওদের বাপের বাড়ির—"

এই সময় দাবাড়ের দল হৈ হৈ করিতে করিতে উপস্থিত হইল, উকিল, মোক্তার, প্রফেসার, একজন বেকার সরকারী খুড়ো। কথাটা চাপা পড়িয়া গেল।

৩

কাহিনীটাকে সংক্ষিপ্ত করিবার জন্য এবার একেবারে সদরালা সাহেবের অন্তঃপুরেই প্রবেশ করা যাক, কেন না ফয়সলাটা আসলে সেইখানেই হইল।

দুইদিন পরের কথা। মর্ণিং কোর্ট, দুপুরের নিদ্রা হইতে উঠিয়া ঘরের মধ্যে একটা আরাম কেদারায় হেলান দিয়া একটা কেসের কথা ভাবিতেছেন, এইবার অফিস ঘরে গিয়া স্টেনোকে দিয়া রায় লিখাইবেন, মা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, দুইটা একথা সেকথার পর বলিলেন—"দাদা এসেছেন, শুনেছিস বোধ হয় ?"

সদরালা সাহেব একটু সচকিত হইয়া প্রশ্ন করিলেন —"এখানে ?"

"এতই কি আক্কেলের মাথা খেয়ে বসবেন ?"

"এই শহরে বলছ ? শুনেছি, কে এক অচলবাবু আছে, সেই নাকি আনিয়াছে।"

একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর—

"শুনেছি নাকি তোর এজলাসেই মকদ্দমাটা উঠেছে ?"

"হ্যাঁ, তাও শুনেছি, ঐ কেস্‌টাতেই নাকি এসেছেন। কেন যে রাজি হন আসতে এভাবে ? একটা বদনাম—"

"শোন কথা ! কেন আসেন ! ভালো উকিল, ডাকে—তাই আসেন।"

"অনেক জায়গায় আর সামলাতেও পারেন না মা, দেখছি তো। মানে, বয়েস তো হয়ে আসছে—"

"ঠিকই তো কথা বাবা, বুড়ো হলে আর যায় সামলান ? তেমনি আবার যিনি বার্ধক্য দেন, তিনি সামলাবার লোকও ঠিক করে দেন। এই তো আমি আর পারি সামলাতে সংসারটা ?—তেমনি আবার বৌমারা রয়েছেন তো—"

ইঙ্গিতটার মধ্যে কোন অস্পষ্টতা নাই, সদরালা সাহেব চুপ করিয়া রহিলেন। একটু পরে মা বলিলেন—"তাহলে ?—থাকব নিশ্চিন্দি ?—দাদা একটা চিঠিও দিয়েছেন— অমনি, বামাচরণ কেমন আছে ? বৌমারা, ছেলেমেয়েরা কেমন আছে ?—একবার যে গিয়ে দেখেও আসব সবাইকে, তার উপায় নেই। শুনছি নাকি তার এজলাসেই মকদ্দমা—গেলে

দেখো না ! নিজের ভাগনের বাড়ি, অথচ একবার যে আসবেন তার উপায় নেই। কেনরে বাপু !"

আবার একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর সদরালা সাহেবই টানিয়া টানিয়া বলিলেন—"নিশ্চিন্দি—মানে, শুনছি কেসটা নাকি অচলবাবুরই অনুকূলে ; এখনও হাতে আসে নি, তবে শুনছি এই রকম। তাইতে যতটা নিশ্চিন্দি থাকা যায় মা। সত্যি, অধর্ম তো করতে পারি না, তুমিও নিশ্চয় বলবেও না তা।"

"তাই কখনও পারি বলতে মা হয়ে ? তবে কথা হচ্ছে, বুড়ো মামা, ছেলেগুলো তেমন মানুষ হল না—'রিটার' করবার সময় পর্যন্তও বাড়ি ছেড়ে ছুটো পয়সার জন্যে ছুটাছুটি করতে হচ্ছে, তাঁকে দেখাও তো একটা ধর্ম বাবা ; 'না' বলতে পারিস,—বল না ?"

"তা তো বুঝি মা, কিন্তু—"

"ঐ বুঝলেই হল, নিতে হবে সামলে একটু ; ঐ তো বললাম—বৌমারা কেন সামলে বেড়াচ্ছেন বুড়ো শাশুড়িকে ? তাঁদের সেটা ধর্ম বলেই তো ?"

পরদিনের কথা। বাসার ওপর-তলায় সদরালা সাহেব যে-ঘরটিতে শয়ন করেন, তাহার সামনে একটু খোলা ছাদ আছে। রাত্রের আহার শেষ করিয়া সেইখানে একটি ডেকচেয়ারে গা এলাইয়া সিগারেট টানিতে-ছিলেন, দ্বিতীয় সহধর্মিণী কিরণময়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কোলে একবছরের বংশধরটি।

জ্যোৎস্না রাত্রি। একটু এদিক ওদিক কথার পর জ্যোৎস্নার সৌন্দর্যের কথা আসিয়া পড়িল, তাহা হইতে সৌন্দর্যমাত্রেরই কথা, শেষে সদরালা সাহেব অভিমত দিলেন সব সৌন্দর্যের পূর্ণ বিকাশ জ্যোৎস্না রাত্রেই। কিরণ-ময়ী এটা সমর্থন না করায় একটু মৃদু তর্ক উঠিল, হারিবার মুখে কিরণময়ী মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"আচ্ছা, আচ্ছা কাব্যি রাখো, ঢের হয়েছে।"

এই গৌরচন্দ্রিকাটুকু সারিয়া নিজেও একটি ডেকচেয়ার টানিয়া উপবেশন করিলেন। আর একটু একথা সেকথার পর বলিলেন—"ঠিক, ভুলেই যাচ্ছিলাম বাজে কথার মধ্যে, দাদা এসেছেন শুনেছ বোধ হয়?"

সদরালা সাহেব 'বিলক্ষণ শুনিয়াছেন, এবং কখন কোন্ পথে কথাটা ওঠে, সেই ভয়ে কাঁটা হইয়া আছেন, অজ্ঞতার ভান করিয়া বলিলেন—"সত্যি নাকি?"

"হ্যাঁ, এসেছেন ; মা লিখেছেন আদালতে বেরিয়েই খুব নাম হয়েছে, এখানকার কে একজন সারদাবাবু নাকি তিনগুণ ফি দিয়ে নিয়ে এসেছে।"

"বেশ আহ্লাদের কথা তো।"

একটু চুপচাপ গেল, তাহার পর কিরণময়ী বলিলেন—"শুনছি নাকি তোমারই এজলাসে আছে কেস্‌টা।"

"ও! অচলবাবুর সেই কেস্‌টা? ওরা ওদিকে মামাকে এনে বসে আছে, মা বলছিলেন।"

এরপর স্তব্ধতাটুকু একটু বেশিক্ষণ রহিল, তাহার পর কিরণময়ী বলিলেন,—"মামাই জিতবেন নিশ্চয়, পুরনো লোক—"

"সেই রকম মনে হয়, কেস্‌টাও ওদের ভালো কিনা।"

আবার একটু চুপচাপের পর কিরণময়ী মুখটা একটু ভার-ভার করিয়া বলিলেন—"মামা না জিতলেও তেমন ক্ষতি ছিল না, অনেক জিতেছেন, এখন রিটায়ার করবার বয়েস, হারলে এমন কিছু লোকসান নেই—"

জবাবের জন্য যথেষ্ট সময় দিয়াও কোনরকম জবাব না পাইয়া আবার বলিলেন—"অথচ দাদা যদি হেরে যায় তো উঠতির মুখে একেবারে মুষড়ে পড়বে।"

"কেস্‌টা নেওয়াই উচিত হয় নি কিরণ—একেবারে জুনিয়ার, এই তো সবে মাস ছয়েক হল জয়েন করেছে আদালত, আজকাল ছ'বছরেও লোকে কিছু করে উঠতে পারছে না।"

কিরণময়ী মুখটা আরও ভার-ভার করিলেন এবং কথাটা এইবার আরও স্পষ্ট করিয়া দিয়া বলিলেন—"নিয়েছেন নিশ্চয় এই ভরসায় যে, ভগ্নীপতি আছেন। প্রাণপণে চেষ্টা তো করবেই। একটু এদিক-ওদিক হয়, তিনি নিশ্চয় সামলে দেবেন।—অবিশ্যি ভুল হয়েছে এরকম ভরসা করা।"

"সেটা কি অধর্ম হয় না কিরণ?"

"একটা মানুষ এল অত দূর থেকে আশা করে, হেরে মনমরা হয়ে ফিরে যাবে, পশার একটু জমবার মুখেই যাবে ভেস্তে—সেইটেই হল ধর্ম? কে জানে বাপু, ধর্মের কথা তাহলে তোমার কাছে নতুন করে শিখতে হয়।"

কথাটা যখন হইয়াই গেল এতটা স্পষ্ট, আর গোপন করিয়া ফল কি! সদরালা সাহেব একটু বিপর্যস্তভাবেই ব্যথিত কণ্ঠে বলিলেন—"তুমি বুঝছ না কিরণ, অচলবাবুর কেস্ এমনই ভালো, তায় মামার মতন একজন সিনিয়ার লোককে নিয়ে এসেছে, তাঁর যদি হার হয়, আর সমরের যদি জিত হয় তো আমার একটা বদনাম হয়ে যাবে না? একেবারে জুনিয়ার, মাস ছয়েকও হয় নি—"

"জুনিয়ার হোন, সিনিয়ার হোন, আমার তো দাদাই। আমারও তো একটা ধর্ম আছে, তাই বললুম। হেরে মুখটি চূণ করে ফিরে যাবেন—কখনও হাসিখুশি বই অন্যরকম দেখি নি দাদার মুখ—"

আঁচলের কোণটা গুটাইয়া ডান হাতে লইলেন। সদরালা সাহেব একবার আড়চোখে দেখিয়া লইয়া একটু সভয়েই বলিলেন—"তাকে বুঝিয়ে বোলো কিরণ, লক্ষ্মীটি, সে নিশ্চয় বুঝবে। শিক্ষিত—"

"আব কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিও না বাপু, এক শিক্ষিতকেই বড় বুঝিয়ে উঠতে পারলাম—সোনার মেডেল পাওয়া—আর তিনি একটা মামুলি বি-এ।—আমারও যেমন জ্বালা; কেন যে অপমান হবার জন্যে বলতে গেলাম—কি করেই যে দাদার সামনে দেখাব এ পোড়া মুখ! এমন অদেষ্ট, এলেন শহরে, একবার যে একটু নেমন্তন্ন করেও খাওয়াব, মায়ের পেটের ভাই—তার ওপব মুখটি চূণ করে—"

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কথাগুলো ভাঙিয়া যাইতে লাগিল, হাতের আঁচল চোখে উঠিল।

* * * *

মকদ্দমার শুনানী হইল। দিন সাতেক পবে রায়ও বাহির হইয়া গেল, অবশ্য সারদাবাবুরই সপক্ষে।

রায়সাহেবের বৈঠকখানায় সেদিন আর স্থিরভাবে বসিয়া দাবা খেলিবার মতো কাহারও মনের অবস্থা নয়। মকদ্দমার রায় লইয়া

রং-বেরঙের আলোচনার হল্লোড় চলিতেছিল। সারদাবাবু নিজের উকিলকে গাড়িতে তুলিয়া দিয়া হাসিমুখে আসিয়া রায়সাহেবের পদধূলি লইতে যাইতেছিলেন, তিনি পূর্বাহ্ণেই মাথায় হাতটা চাপিয়া বলিলেন —"প্রণাম হবে'খন—বড় যে খবর রাখেন, আগে রায়বাহাদুরের খবর দিন তো। ভারি যে রায়সাহেবের ঘাড়ে চড়তে এসেছিলেন, আছেন কোথায় এখন ছিটকে পড়ে?—এ মকদ্দমা সারদা পাল বনাম অচল চৌধুরীও নয়, রায়সাহেব বনাম রায়বাহাদুরও নয়, একেবারে বাবার শালা versus নিজের শালা, মায়ের দাদা versus গিন্নীর দাদা— রায় মকদ্দমার আগেই লিখে রাখতে পারা যায়।—"

হাসি হুল্লোড়ের মধ্যে অপর কে একজন বলল—"তা বৈকি, আর এ রায় তো সাহেব কেরাণীকে লেখাচ্ছেন না, মেমসাহেব লেখাচ্ছেন সাহেবকে।—খোকার মামাকে এই শহরেই এসে আস্তানা গাড়তে বললেন না কেন মশাই?—"

রমেন রায় খুব একচোট মাতামাতি করিয়া বেলা প্রায় আড়াইটার সময় মেসে ফিরিল। কমিটির অফিসে মিটিং ছিল বেলা প্রায় ন'টার সময়, বহুবাজার-ওয়েলিংটন-ধর্মতলা হইয়া প্রসেশন লইয়া গেলে কম্যুনিষ্টদের একেবারে নাকের নিচে দিয়া যাইতে হইবে, সংঘর্ষ অনিবার্য, সুতরাং যাওয়া হইবে কিনা সেই লইয়া তুমুল আলোচনা চলিল। একটা ভালো দিন, স্বাধীনতার দ্বিতীয় বাৎসরিক উৎসব, যদি সম্ভব হয় তো এদিনটাকে অক্ষত রাখিবারই ইচ্ছা ছিল অনেকের, মেয়েদের মধ্যে নীলিমার। নীলিমা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল—"সেদিনের মিটিং-এ আমি ছিলাম না, কিন্তু শুনলাম কোন পথে যাওয়া হবে স্থির করতে পারা যায় নি বলেই একটা অলটারনেট রুট-এর ব্যবস্থা করে রাখা হয়েছে লাইসেন্সে। আমার তো এইটেই আশ্চর্য বোধ হচ্ছিল এরকম একটা দ্বিধা পেরেছিল উঠতে আমাদের মনে। আমরা আজকের দিনটিকে নিষ্কলুষ রাখতে চাই, সেটা তখনই সম্ভব হতে পারে যদি নিতান্ত নির্বিরোধ ভাবেই আমরা সে আনন্দটুকু উপভোগ করবার চেষ্টা করি। ওদের ঈর্ষাকে খোঁচা দিয়ে জাগাতে গেলে—"

রমেন উঠিয়া দাঁড়াইল।

"কোথায় ঈর্ষা আছে ভ্রূ কুঁচকে, কোথায় হিংসা আছে তার অস্ত্র শানিয়ে—অত খতিয়ে দেখতে গেলে কি আজকের দিনটি আদৌ এনে ফেলতে পারতাম আমরা ?"

অনেকের ভ্রূ ই কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—বিস্ময়ে। কানাঘুষায় রমেনের নাম পড়িয়া গিয়াছিল নীলিমার 'ইয়েস ম্যান'—মূল কথা নীলিমার, রমেন

বলিবে—'তাই তো, তাই তো,' এই ছিল নিয়ম, আজ হঠাৎ ব্যতিক্রম যে!

ভ্রূ কুঞ্চিত হইল না নীলিমার, সে যেন জানিতই এই রকম হইবে। বেশ সহজ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—"কিন্তু সাধনার নিয়ম আর সিদ্ধির নিয়ম এক হবে! সিদ্ধির মধ্যে থাকুক না খানিকটা ক্ষমা: তা সিদ্ধিকে উজ্জ্বলই করবে। এই স্বাধীনতা আনতে যারা বাধা দিয়েছিল—"

বাধা দিয়াই বলিল—"ক্ষমা কিন্তু সিদ্ধিকে উজ্জ্বল না করে স্পর্ধাকে প্রবলও করতে পারে। এই স্বাধীনতা আনতে যারা বাধা দিয়েছিল, তারা সেটা দিয়েছিল অক্ষম স্পর্ধায়, প্রতি পদেই যদি তাদের সে কথাটি না জানিয়ে দিই তো তাদের স্পর্ধা যাবে বেড়ে। আর সেটা যাচ্ছেই যে বেড়ে তার প্রমাণের অভাব আছে কি? ক্ষমা আসে নিশ্চিন্ততা থেকে, কিন্তু সে-নিশ্চিন্ততার অবসর ওরা দিয়েছে কি? আমার মতে স্বাধীনতাও যেমন অর্জন করবার জিনিষ, ক্ষমাও তেমনই—ওরা করুক অর্জন, আমরা দোব হাত তুলে।"

তর্ক জমিয়া উঠিল। পলিটিক্সের মধ্যে এ আবার নূতন পলিটিক্স,—রমেন হঠাৎ নীলিমার উল্টা দিকে যায় কেন! মেয়েদের মধ্যে বেশির ভাগই রমেনের পক্ষে আসিয়া গেল, কারণের মধ্যে অবশ্য একটাই প্রকাশ পাইল—এড়াইয়া গেলে ওরা অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরা এও তো ভাবতে পারে, ভয়ে ও-পথ মাড়াইল না, আজকের মতো একটা গৌরবের দিনে ও মিথ্যা-অগৌরবটা মাথা পাতিয়া লই কেন? এমন একটা তর্ক যে বেটাছেলেদের মধ্যে যাহাদের ইচ্ছা ছিল এমন অনেকেও নীলিমার দিকে যাইতে পারিল না। ঐ পথই ঠিক হইল মিছিলের জন্য।

সংঘর্ষও হইল। অ্যাম্বুলেন্সও আসিল। অনেকগুলিকেই তুলিতে হইল তাহাতে, সবচেয়ে বেশি আহত অবস্থায় নীলিমা। রমেন—আজকের অভিযানের পাণ্ডা রমেন নিশ্চয় তাহা হইলে মৃতকল্প হইয়াই

কোনখানে পড়িয়া আছে। খোঁজ পড়িয়া গেল, কিন্তু পাওয়া গেল না কোনখানেই।

এ-মেসটা ছাড়িতে হইল রমেনকে। এ পাড়ার পলিটিক্সও ওর গেল কাঁচিয়া, আর থাকা চলে না। পটলডাঙা থেকে বাগবাজারে একটি জানাশোনা মেসে গিয়া উঠিল। সেখানে পরিচয় হইল বীরেশবাবুদের সঙ্গে।

রাস্তাটা একটা চওড়া গলি। এদিকে রমেনদের মেস, ওদিকে কয়েক হাত দক্ষিণে গিয়া বীরেশবাবুদের দোতলা বাড়িটা। সামনে একটা গেট, তাহার পর হাত দশেকের একটা ছোট প্রাঙ্গণের পর একটা বারান্দা, বারান্দার দুইদিকে দুইটা বড় ঘর, বাঁয়েরটা বৈঠকখানা, ডাইনেরটা বাড়ির মধ্যে পড়ে।

বাড়িটা পলিটিক্সের একটা আড্ডা। বীরেশবাবু নিজে একজন অধ্যাপক। বয়স আন্দাজ পঁয়তাল্লিশ হইবে—উগ্র কম্যুনিষ্ট। তবে বয়স হইয়াছে, কাজ এক সময় যদি বা কিছু কিছু করিয়া থাকেন, এখন থিয়োরী আর তর্ক লইয়া আছেন।

তবে কাজ করিবার লোক আছে। চারটি ছেলে কম্যুনিষ্ট, একটি বিধবা ভগ্নী, বছর ত্রিশ বয়স, পাকা কম্যুনিষ্ট। একটি সধবা ভগ্নী, তাঁহার স্বামী সুদ্ধ কম্যুনিষ্ট, এই গলিতেই অল্প একটু দূরে বাড়ি, কিন্তু এই বাড়ির কর্মকেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। তারপর আছে বীরেশবাবুর বাইরের শিষ্য সাকরেদরা, সমস্ত দিনই বাড়িটাতে একটা কর্ম-চঞ্চলতা লাগিয়া থাকে।

এ-বাড়ির সঙ্গে রমেনের পরিচয় করাইল সুকুমার। ছেলেটি এইদিক-কারই একটি বড় দৈনিক কাগজের অফিসে কাজ করে, একেবারে

অষ্টপ্রহর খদ্দরধারী কংগ্রেসী, সেই সূত্রেই রমেনের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হইল। পলিটিক্সের যা'কিছু চর্চা এখানে আসিয়া অবধি তা' ঐ সুকুমারের সঙ্গেই হয়। কিন্তু আশ মেটে না, মাত্র দু'জনের আলোচনা, তায় মতের প্রভেদ নাই, আর হইলই যদি কখনও রমেনের দিক থেকে, তো সুকুমার এমন নির্বিরোধ ভাবে মানিয়া লয় যে তর্ক একেবারে দানা বাঁধিতে পারে না। রমেনের অভ্যাসটা অন্যরকম। সেও অবশ্য মানিয়া লইত এক সময়, কিন্তু সে শুধু নীলিমার কথা, তাহার পর কিন্তু এই মানিয়া-লওয়া থেকেই অন্যদের সঙ্গে তর্ক জমিয়া উঠিত। তাহার ওপর ছিল কাজ, প্রসেশন, মিটিং, হেন তেন। এ যেন দিন দিন মিয়াইয়া যাইতেছে।

মুশকিল হইতেছে একেবারে কাজ লইয়া নামিতে সাহস হইতেছে না। কংগ্রেসের ছোট বড় কমিটিগুলার মধ্যে একটা জ্ঞাতি সম্বন্ধ আছে, প্রত্যেকটা প্রত্যেকের ভালোমন্দেব খবব রাখে, স্বাধীনতার দিনের ব্যাপারটা জানাজানি হইয়া যাইবে।

একদিন সামনের ঐ বাড়িটার কথা সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করিল। বাড়িটা এ-পাড়ায় অনেক দিক দিয়াই বিশিষ্ট, ওখানে মাঝে মাঝে যে তর্কের লহরী ওঠে, স্পষ্ট কিছু বিশেষ বোঝা না গেলেও তাহার কল্লোলটা কখনও কখনও এখানে আসিয়া পৌঁছায়; সর্বোপরি, সুকুমারকে কয়েকবাব ও-বাড়িতে যাইতে এবং ও বাড়ি থেকে বাহির হইতে দেখিয়াছে। একদিন প্রশ্ন করিল—"ও বাড়িটা কার? একটা উষ্ণ-প্রস্রবন বলে মনে হয় যেন?"

"বীরেশ লাহিড়ীর বাড়ি, তুমি জান না?"—বেশ বিস্মিতভাবেই মুখের পানে চাহিল সুকুমার।

"তোমার কথার ভাবে বোধ হচ্ছে বিশ্ব-বিশ্রুত লোক। না জানার অপরাধটা মেনে নিচ্ছি, কিন্তু তুমিও ত জানাও নি।"

"মস্ত বড় কম্যুনিষ্ট।—আমি মনে করতাম তুমি জান, আর কম্যুনিষ্ট বলেই আগ্রহ নেই।"

"আগ্রহ আর রইল না—কিন্তু একটা কথা, তোমাযও তো যেতে দেখেছি, আসতে দেখেছি। অথচ খদ্দরের তো তীর্থস্থান ওটা নয়।"

সুকুমার অল্প একটু থামিয়া বলিল—"হ্যাঁ, আমার পরিচয় আছে বীরেশবাবুর সঙ্গে—আর সেই জন্যেই তোমায় নিয়ে যেতে সাহস করি নি।"

"হেঁয়ালিটা একটু ভেঙে বলো।"

"ঐ তো বললাম, একজন ঘোর কম্যুনিষ্ট। এখন আর কাজকর্ম কিছু করেন না নিজে, শুধু ডিরেক্‌শন্‌ দেন? আর, সেটা ভয়ের কথা, সাকরেদ মোড়াবার ঝোঁক আছে। তোমায় হারাতে পারি ওখানে নিয়ে গেলে।"

"কিন্তু কৈ নিজেকে তো হারাও নি?"

আবার একটু থামিল সুকুমার। কি যেন ভাবিয়া লইয়া বলিল—"হয় তো পারিও হারিয়ে ফেলতে একদিন।—তা বেশ, তোমার আপত্তি না থাকে, চলো না। ভালোই, আমি একজন দোসর পাই। তর্কে বড্ড কোণ-ঠাসা করেন মাঝে মাঝে।"

সেই একদিন সন্ধ্যার পর গেল রমেন। জন সাত-আট যুবক সামনের চৌকিতে বসিয়া আছে, আলোচনা হইতেছে, সুকুমার যাইতে যে বিরতিটুকু হইল, তাহাতেই সে পরিচয় করাইয়া দিল, অবশ্য সংক্ষিপ্ত—বন্ধু, ওরই মেসে থাকে, অমুক অফিসে কাজ করে। রাজনীতিগত পরিচয়টা আর দিল না।

একটু মোটা-সোটা মানুষটি, মুখশ্রী প্রসন্ন, প্রায় সব মোটা মানুষের

মতো হাসির ভাগটা তাহাতে একটু বেশি। অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন—"এসো, সুকুমারের বন্ধু তুমি, বেশ আনন্দ হোল।"

চা বোধ হয় সবে হইয়া গিয়া থাকিবে, আরও দুজনের জন্য বলিয়া দিলেন।

রাজনীতিগত পরিচয়টা রমেন নিজেই দিল।—

বীরেশবাবু আবার আরম্ভ করিলেন—"হ্যাঁ, যা বলছিলাম, এটা স্বাধীনতা যখন নয় তখন এটা নিয়ে আমরা অত লাফালাফি করতে যাব কেন! এ-স্বাধীনতা আমাদের ডেফিনেশনের সঙ্গে মিলছে না। আমাদের স্বাধীনতা সব মানুষ নিয়ে। ওরা যেটাকে নিয়ে লাফালাফি করছে সেটাকে হদ্দ ওপরের কতকগুলো লোকের কতকগুলো কাজ করবার সুযোগ বলে মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু সে-সুযোগ তো আরও সাংঘাতিক—তার মধ্যে নতুন-লাভ করার উন্মাদনা আছে, অথচ সে-উন্মাদনাকে সংযত করবার জন্যে যে জনমতের দরকার সেটা নেই একেবারে। সুতরাং ও-সুযোগে সেই 'কতকগুলো কাজ' যে কি ধরণের হবে, তা বেশ বোঝা যায়, বুঝছিও তো দিন দিন—"

রমেন বাধা দিল—"মাফ করবেন, উদ্ধত মনে করবেন জেনেও একটা প্রশ্ন করি—এই সুযোগটা কংগ্রেস না পেয়ে যদি আপনারাই পেতেন একটা চান্স দিতেন না কি?"

একেবারে সম্মুখ আক্রমণ, তর্কটাতেও জোর আছে, অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গে সেটাকে আরও জোরালো করিয়াছে। বীরেশবাবু অবশ্য একটু বিস্মিত ভাবেই মুখের পানে চাহিলেন, তবে মুখের প্রসন্নভাটা ফিরিয়া আসিতে দেরি হইল না, বরং মনে হইল প্রসন্নতার সঙ্গে একটু প্রশংসাও রহিয়াছে; একটু হাসিয়াই প্রশ্ন করিলেন—"অর্থাৎ বলছ ঈর্ষায় বলছি কথাটা?"

"সেই ধারণাই কি জন্মাবে না মনে সবার?"

"যে-সব মনে এই রকম ধারণা জন্মায়, সেই সব মনের ওপর শ্রদ্ধা রাখতে গেলে কি কোন কাজ চলে পৃথিবীতে ?"

"অশ্রদ্ধার কথাটা আপনাদের মুখে কেমন করে মানাবে ? আপনারা প্রোলিটেরিয়েটকে পর্যন্ত কোল দেন—"

"কিন্তু মনের দিক দিয়ে প্রোলিটেরিয়েটদের মতন অমন শ্রদ্ধেয় আর কিছুই যে নেই—"

এই সময় খুব জরুরী কাজ লইয়া একটু বয়স্থ গোছের জন চারেক কর্মী আসিয়া পড়ায় তর্কটা ঐখানেই শেষ হইল। বীরেশবাবু বলিলেন —"বেশ লাগছিল তোমার কথাগুলো, এইখানেই তো থাক, এসো মাঝে মাঝে !—স্থকুমারই নিয়ে আসবে রমেনকে।"

গলি দিয়া আসিতে আসিতে রমেন প্রশ্ন করিল—"কি হে, আমায় হারাবে বলে ভয় হচ্ছে ?"

স্থকুমার শুধু একটু হাসিয়া বলিল—"আরম্ভটা তো হতাশজনক নয়।"

কাজের নমুনা স্বাধীনতা দিবসেই দেওয়া হইয়াছে, নিতান্ত স্বাভাবিক নিয়মেই, তর্কের দিকে ঝোঁকটা বেশি রমেনের। বীরেশবাবুর বাড়িটা একটা মস্তবড় 'আকর্ষণ' হইয়া পড়িল। হারিবার ইচ্ছা না থাকিলে হারার প্রশ্ন ওঠে না। এই তো স্থকুমার রহিয়াছে, এতদিন ধরিয়া যাওয়া-আসা করিতেছে, বড় তার্কিক নয়ই, বরং এত সহজে আর বিনয়ের সঙ্গে প্রতিপক্ষের কথা মানিয়া লয় যে, মনে হয় যে-কোন মুহূর্তেই ধর্মান্তর গ্রহণ করিবে ; কিন্তু তবুও তো এখনও সে-ই খদ্দরধারী অটল কংগ্রেসী। রমেনের আবার রাজনীতি মানে মাত্র তর্ক, যদি ধর্মান্তরই গ্রহণ করে, বিরোধই যায় মিটে, তো ওর রাজনীতি থাকে কোথায় ?

তবু করিল গ্রহণ।

বৈঠকখানায় যেখানটায় বসে, সেখান থেকে বাইরের বারান্দা, এমনকি বাইরের উঠানেরও খানিকটা দেখা যায়। একদিন সন্ধ্যার পর জোর তর্ক চলিয়াছে। বিষয়টা ছিল, যুদ্ধের সময় ভারতীয় কম্যুনিষ্টদের আচরণ। তর্কের সুবিধা রমেনেরই, বেশ জোরও লাগাইয়াছিল, এমন সময় একটি মেয়ে গটগট করিয়া আসিয়া বারান্দায় উঠিল এবং একবার এঘরের দিকে চকিতে মুখটা ঘুরাইয়া আবার বারান্দা দিয়া ওদিককার ঘরে চলিয়া গেল। যেমন ভাবে বসা, তাহাতে নজর পড়িল বোধ হয় শুধু রমেনেরই।

মেয়েটি বীরেশবাবুর বোনেদের মধ্যে কেহ নয়। বয়স সতের-আঠার বলিয়া মনে হইল। এদিকে ঘুরিতে বারান্দাব মধ্যেকার বাম্বের আলোটা মুখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার মুখটা ওদিকে ঘুরিয়া গেল। যেমন ভাবে চলিয়া গেল তাহাতে মনে হইল এই বাড়িরই মেয়ে। অবশ্য রমেম আজ এই প্রথম দেখিল।

বীরেশবাবু একেবারে ভিতরের দিকে একটা ইজি-চেয়ারে। রমেনের তর্কের গলা যে হঠাৎ কেন অমন স্তিমিত হইয়া গেল বুঝিতে পারিলেন না।

ঘটনাটি ছোট, কিন্তু রমেনের জীবনে অনেকগুলি দ্রুত পরিবর্তন আনিয়া দিল। প্রথমত বীরেশবাবুব বাসায় যাতায়াত বাড়িয়া গেল। ঐটুকু আসিতে বুকের ধুক্‌ধুকুনি যায় বাড়িয়া,—বারান্দা, প্রাঙ্গণ পর্যন্ত দেখা যায়—সেই চেয়ারটি খালি আছে তো?—তর্কের ঝাঁজ কমিয়া আসিল, তাহার পর উত্তর দেবার উৎসাহ কমিয়া শ্রদ্ধাভরে বীরেশবাবুর কথাগুলা শোনার প্রবৃত্তিটা গেল বাড়িয়া। ক্রমে দেখা গেল এক-আধটা কথা মানিয়াও লইতেছে, তাহার পর এমনও হইল বাহ্যত প্রতিপক্ষ হইলেও বীরেশবাবুর তর্কেই এক-আধবার সাহায্য করিয়া বলিতেছি।

ইতিমধ্যে মেয়েটিকে দেখিলও কয়েকবার। ঘুরিয়া চাহিল আর মুখে আলো পড়িল এমন যোগাযোগ কমই হয়। তবে উঠিয়া আসিল, শরীরটা

ঘুবাইয়া ও-ঘরে চলিয়া গেল, এ দৃশ্য এই সপ্তাহখানেকের মধ্যে বার পাঁচেক চোখে পড়িল। একদিন বাড়ি হইতে বাহির হইয়া বাবান্দা দিয়া নামিয়া গেল, দিনের বেলা। সেদিন সম্পূর্ণ ছবিটি দেখিল রমেন।

সুকুমারকে প্রশ্ন কবিতে অত্যন্ত বাধ বাধ ঠেকে। একে এর মধ্যে কয়েকবাবই ঠাট্টা কবিয়াছে—"তুমি তো দেখছি মাথা মুড়োলে বলে রমেন। বলি নি যে তোমায় হারাতে হবে?"

তবুও একদিন তুলিল কথাটা—"হোক কম্যুনিষ্ট, কিন্তু নিজেদের কাজে সবাই বড় সিন্‌সিযার হে, এ যশটা দিতে হয়। ঐ একটা মেয়ে—বীরেশ-বাবুর বোন নয—এমন ব্যস্ত সমস্ত হয়ে যায় যেন পার্টিব যত কাজ একা ওরই হাতে—দেখলাম কিনা একদিন হঠাৎ।"

সুকুমার শুধু একটু হাসিল, উত্তব দিল না, সুতবাং কথাটা আব বাড়ান গেল না।

মেযেটি কে?—অথচ এই বাড়িরই মেযে তো—এই আপাদমস্তক কম্যুনিষ্টদের বাড়িব।

দিন চাব-পাঁচ প্রাণপণে যুঝিল রমেন—সঙ্কোচেব সঙ্গে, বিবেকেব সঙ্গেও, কেননা রমেনদেরও বিবেক থাকে একটা, তাহার পর জিতিল। —অর্থাৎ হারিল। সুযোগ খুঁজিতেই ছিল, একদিন বীরেশবাবুকে একা পাইযা বলিল—"আপনার তর্কে আমি কন্‌ভিন্‌সড হযে গেছি, আমায় কাজ দিন।"

এর পব অবশ্য আব সবাইও জানিল, ঐ প্রথম বলা-টুকুতেই যত বাধা থাকে কিনা। সুকুমাবও শুনিল, সহিযা সহিযা ব্যাপারটা এই পবিণতিতে আসিযাছে বলিয়াই বোধ হয় বিশেষ বিস্মিত বা বিচলিত হইল না।

তাহার পর আর মাত্র একটি দিনের কথা।

সন্ধ্যার পর। বর্ষা নামিযাছে বলিয়া কেহ আসে নাই, আছে শুধু সুকুমার, রমেন আর বীরেশবাবু।

যেমন একটু সদা-অন্যমনস্ক, ব্যস্ত-সমস্ত ভাব, সেইভাবেই এ মেয়েটি আসিয়া এই ঘরে প্রবেশ করিল, হাতে একটা ফ্লানেলের হাফ-শার্ট, বলিল —"এই জামাটা গায়ে দাও বাবা, জোলো হাওয়াটা ঠাণ্ডা।"

বীরেশবাবু বলিলেন—"এই দেখো! তুইও কম্যুনিষ্ট বাবার ঘর·

মাড়াবি না সিপ্রা, রমেনের সঙ্গে তোর পরিচয়ও করে দেওয়া হয়ে ওঠে নি। রমেন রায়, আমার একেবারে নতুন শিষ্য।—এ হচ্ছে সিপ্রা, রমেন, আমার মেয়ে—তোমার মতন এতবড় উগ্র কংগ্রেসীকে ছিনিয়ে আনতে পারলাম রমেন, কিন্তু আমার মেয়ের কাছে আমি এখনও পরাস্ত। আমার মেয়ের কাছে আর সুকুমারের কাছে—এই ছুটি ব্ল্যাক শীপ্ রয়েই গেল বোধ হয় আমার গণ্ডীর মধ্যে—"

নিজের রসিকতায় বেশ প্রাণ খুলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

* * * * *

রমেন রায় ও-মেস আর ও-পাড়াও দিয়াছে ছাড়িয়া।

কুমুদবন্ধু বি. এ. রেলওয়ের পার্বতীপুর স্টেশনে কাজ করিতেছিলেন। চেষ্টা-চরিত্র করিয়া বদলির হুকুমগুলা রদ করাইয়া সতের বৎসর এক জায়গায় কাটিল ; দু-পয়সা পাইতেন, শহরে জায়গা-জমি কিনিয়া বাড়ি-বাগান করিয়া বেশ গুছাইয়া লইয়াছিলেন, এমন সময় গোলমাল আরম্ভ হইল। কলিকাতা, ঢাকা, নোয়াখালি। তাহারপর পার্বতীপুরেও দু-একটা মাঝারি গোছের ধাক্কায় সাক্ষাৎ পরিচয় দিয়া গেল। তাহার পর আসিল স্বাধীনতার সঙ্গে দেশ-বিভাগ এবং সেই সঙ্গে লোক-বিভাগও। কর্মচারীদের বলা হইল তোমরা কে কোন্‌দিকে থাকিতে চাও বাছিয়া লও। পরাধীনতার আমলেই পাকিস্থানী স্বাধীনতার নমুনা পাওয়া গিয়াছিল, কুমুদবন্ধু হিন্দুস্থানের সপক্ষে নাম লিখাইলেন। কিছুদিন পত্রাচারে কাটিল, তাহার পর যখন এদিকেও অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে, ওদিকেও আশার কোন লক্ষণ নাই, এমন সময় যুক্তপ্রদেশের একটি বড় রেল অফিস হইতে ডাক পড়িল, পার্বতীপুরের সতের বৎসরের বাস উঠাইয়া কুমুদবন্ধু সপরিবারে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিতান্ত কম নয় —নিজে, স্ত্রী, দুইটি কন্যা, চারিটি পুত্র—বছর দশের মধ্যে ; বিধবা এক দিদি, তাঁহার একটি ছোট দৌহিত্র।

আসিয়াই একেবারে অকূলে পড়িলেন।

প্রথম সপ্তাহটা প্ল্যাটফর্মে কাটাইতে হইল। তাহার পর ওয়েটিং-রুমের সামনের বারান্দায়। দিদি মহামায়া খুব শক্ত মেয়েমানুষ, কিন্তু তিনিও এক সপ্তাহে অধিক অগ্রসর হইতে পারিলেন না। তবে লড়াইয়ের জন্য পা পুঁতিবার একটা জায়গা পাইলেন এবং দুই দিন পরেই ওয়েটিং রুমের একটি কোণ স্বীয় পরিবারের জন্য দখল করিলেন।

কোন ব্যবস্থা নাই, অসংখ্য লোক পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আসিয়া পড়িয়াছে, প্রতিদিনই আরও আসিতেছে। কাহারা ডাকিতেছে, কি উদ্দেশ্যে, কিছুরই সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সকালবেলায় উঠিয়া মহামায়া তোলা উনানে 'ওয়েটিং রুমের মধ্যেই রান্নার ব্যবস্থাটা করিয়া ফেলেন, দুইটি কোনরকমে নাকে মুখে গুঁজিয়া কুমুদবন্ধু সেই যে বাহির হন, ফেরেন একেবারে সন্ধ্যাব সময়। ইহার মধ্যে কত আফিস ঘোরেন, কত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—কোনো ফলই হয় না। রেলটার অব্যবস্থার কথা পূর্বে শোনা ছিল, কিন্তু সেটা যে এ ধরণের কিছু হইতে পারে এমন জানা ছিল না। মাসখানেক ওয়েটিং-রুমে কাটিল, পশ্চিমের শীত বেশ ভাল করিয়া জাঁকিয়া আসিতেছে, দিদির মেজাজ অত্যন্ত বিগড়াইয়া যাইতেছে, প্রত্যহই ওয়েটিং-রুমটায় রান্নাঘরের ধোঁয়া জমিয়া উঠিলে স্টেশন মাস্টাব থেকে স্টেশনের যত কর্মচারী আসিয়া দরজাব বাহিরে জমা হয়, ওদিকে মহামায়াও আসিয়া দাঁড়ান, গাছকোমর বাঁধা, হাতে খুন্তি ; মুখে তুবড়ি ছুটিতে থাকে—"ড্যাকরারা, অলপ্পেয়েরা, ডেকে এনে না দেবে চাকরি, না দেবে থাকবাব জায়গা, ঐ ম্লেচ্ছ কাপড়-চোপড় নিয়ে আমার রান্নাঘরের চৌকাঠের এদিকে পা দিলে একধার থেকে ঝোঁটিয়ে বিষ ঝেড়ে দেব! আয় না, হেস্মৎ থাকে, আয়!"

এংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশন মাস্টার একবার দায়ে খালাস হওয়া গোছের চেষ্টা করিয়া সরিয়া পড়ে, বেচারাদেব দুর্দিন পড়িয়াছে, এখন সবই সন্ত্রস্ত, খুন্তিপেটা খাইলেও আহা বলিবার কেহ নাই। দেশী কর্মচারীরাও একে একে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়, মহামায়াই রোজ জেতেন, কিন্তু এ ভাবে আর চলে না কুমুদবন্ধুর কতবার মনে হইয়াছে আবার পার্বতীপুরে গিয়াই যেমন করিতেছিলাম সেইরূপ চাকরি করি কিন্তু কয়েকবারই সন্ধান লইয়া জানিয়াছেন ও-পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। এদিকে এরা মুসলমানদের জন্য দুয়ার খুলিয়া রাখিলেও, ওদিকে ওরা অর্গলিত করিবারও হাঙ্গাম

রাখে নাই, দুয়ারের জায়গায় দেয়াল তুলিয়া দিয়াছে, আর কোন আশাই নাই।

শীত প্রচণ্ড হইয়া আসিল, হাতের পয়সাও ফুরাইয়া আসিয়াছে, অবশেষে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া কুমুদবন্ধু চাকরির আশা ত্যাগ করিয়া নিতান্তই অদৃষ্টের ওপর নিজেদের ছাড়িয়া বাড়িতে ফিরিয়া যাইবেন স্থির করিয়াছেন, এমন সময় পার্বতীপুর অফিস ঘুরিয়া তাঁহার হাতে একখানি বড় খাম আসিয়া পড়িল। খুলিয়া দেখিলেন—তাঁহার চাকরি হইয়াছে এই স্টেশনেই, হিসাবের সেরেস্তায়; বাসাও ঠিক হইয়াছে, একখানি চার-চাকার, অর্থাৎ সবচেয়ে যা ছোট সেই রকম মালগাড়ি। কুমুদবন্ধু ওটাকে লেখা-পড়া করাইয়া আট-চাকার করাইয়া লইলেন, এর পিছনে এংলো-ইণ্ডিয়ান স্টেশন মাস্টার ও অন্যান্য কর্মচারীদের যে অক্লান্ত চেষ্টা ছিল এটুকু না বলিলে অধর্ম হয়, অবশ্য তাহার পিছনে ছিল মহামায়ার রান্নার খুন্তি আর ক্ষুরধার জিহ্বা।

ওয়েটিং-রুম ছাড়িয়া সকলে নূতন সচল বাসায় গিয়া অধিষ্ঠিত হইলেন।

২

একেবারেই অভিনব ধরণের পল্লী। বিরাট স্টেশন-প্রাঙ্গণের একধারে এমন প্রায় দেড়শ'খানা মালগাড়ি, চার-চাকার, ছয়-চাকার, কয়েকখানা আট-চাকারও, ঐ এক একখানা বাড়ি। অসহ্য কষ্ট, জায়গা নাই, দিনের বেলায় তাতিয়া ওঠে, শীতের দিন বলিয়া আরামের না হইলেও খুব বেশি কষ্টও হয় না, কিন্তু রাত্রে অসহ্য। প্রায় সবই পূর্ববঙ্গের লোক, পশ্চিমের নিদারুণ শীতে যেন জমিয়া যাইবার মতো হয়। কয়লাও প্রচুর নয়, সন্ধ্যার একটু আগে প্রত্যেক বাসার সামনে সারি সারি তোলা উনুনে

আগুন জ্বলিতে থাকে, সমস্ত পাড়াটা ধূমে ধূম্রাকার হইয়া ওঠে; উনুন ধরিলেই সেগুলা গাড়ির মধ্যে উঠিয়া যায়, তাহাতে রান্না, তাহাতেই যতটা সম্ভব তাপ সঞ্চয়। শেষ রাত্রে শীতে আর কাহারও ঘুম হয় না, সবাই গুটিসুটি মারিয়া বসিয়া থাকে।

তবুও মানুষ পরের দুরবস্থা দেখিয়া আশ্বাস পায়, শত শত লোক প্ল্যাটফরমে পড়িয়া আছে, এ তবুও তো একটা আচ্ছাদন। দিনের বেলা এই দুঃখের জীবন থেকে যতটা পারে রস নিংড়াইয়া লয় লোকেরা, ছেলেরা ছুটোপুটি করে, গৃহিনীরা বৌ-ঝিয়েরা এ-বাসা সে-বাসা ঘুরিয়া আলাপ করিয়া বেড়ায়, কোয়ার্টার্সের জন্য কোথায় ইট পড়িতেছে সেই সব আলোচনা লইয়া আশায় বুক বাঁধে। মানুষের সবই সয়, তা ভিন্ন এটা বিশেষ করিয়া সহিবারই যুগ, একটা কল্পনার ভবিষ্যৎ গড়িয়া লইয়া মানুষ কল্পনাতীত এই বাস্তব বর্তমানকে ভুলিতেছে। কুমুদবন্ধুর পরিবারও ধীরে ধীরে এই দলে মিশিয়া যাইতেছে। পাঞ্জাবে যা কাণ্ড হইতেছে সে হিসাবে এ ত স্বর্গ, পার্বতীপুরের কথা আর ভাবাও যায় না।

কিন্তু এ স্বর্গেও কপালে বেশি দিন কাটিল না।

প্রথমটা বাদ সাধিল পয়েন্টসম্যান রামদিন, পাইলট ড্রাইভার করিম শেখের সহযোগিতায়। অবশ্য ভুল করিয়াই, তবে সে-ভুলেও এই রেলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ আছে।

বাসাগুলি স্টেশন-প্রাঙ্গণের নিতান্ত একদিকে পড়িয়া আছে বটে তবে একেবারে যে স্থাণু এমন নয়। লাইনের ওপর মাঝে মাঝে চলাফেরা করে। প্রত্যহ নূতন বাসা আসিতেছে, তাহাদের জায়গা দিতে হয়, রোজই দু'একখানা করিয়া পুরানো বাসা স্থানান্তরিত হইতেছে, হয়ত কেহ অন্য স্টেশনে বদলি হইল, হয়ত কোন বাসার অধিকারী পাকা কোয়ার্টার্স পাইল, তাহাদের পথ ছাড়িয়া দিতে হয়। ডিপার্টমেন্টে হুকুম দেয়, পয়েন্টসম্যানের নির্দেশে পাইলট ইঞ্জিনে কাজটা সম্পন্ন করে।

ছেলেমেয়েরা, বধূ-গৃহিণীরা মাঝখান থেকে খানিকটা গাড়ি চড়ার আনন্দ উপভোগ করিয়া লয়। এমনও হয় কর্তা অফিস থেকে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, হয়ত লাইনের ভেতরের দিকের একটি বাসা অন্য স্টেশনে বদলি হইয়াছে, তাঁহার বাসাটিকে পথ ছাড়িয়া অন্য লাইনে একটু সরিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছে। খানিকক্ষণ পরে পাইলট ইঞ্জিন আবার ল্যাজে করিয়া আনিয়া রাখিয়া গেল।

এই রকম কিছু একটা ব্যাপার কুমুদবন্ধুর বাসা লইয়াও হইতেছিল সেদিন সন্ধ্যাবেলায়।—

পয়েণ্টস্‌ম্যান রামদিনের ডিউটির শেষ দিক এটা, এইটুকু শেষ করিয়া নিজের বাসায় যাইবে, এক লোটা ভাঙ্‌ তৈয়ার আছে সেবন করিয়া দড়ির খাটিয়ায় গা এলাইয়া দিবে। একটু ব্যস্ত আর অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছে। পাইলট করিম শেখের ডিউটির এই আরম্ভ, একটু বাঁধামাত্রার নেশা করিয়া কাজে নামে, কাজ করিতে করিতে সেটা কাটিয়া যায়। ঠিক কাটার অবস্থাটা এখনও দাঁড়ায় নাই।

কুমুদবন্ধু অফিস থেকে ফিরিয়া একটু জলযোগ করিয়া এই সময়টা ক্লাবে যান, সেখানেই গেছেন। শীত বেশ জমিয়া আসিয়াছে। লোহার উনুনটা ধরিয়া গেছে, সেটাকে গাড়ির মধ্যে তুলিয়া দু'দিককার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া রান্নার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় রামদিনের গলার 'হুঁসিয়ার! হুঁসিয়ার!' শব্দ হইল এবং পাইলট আসিয়া আস্তে আস্তে গাড়িটার সঙ্গে যুক্ত হইল। মহামায়া দরজার ফাঁক দিয়া মুখটা বাড়াইয়া বলিলেন,—"কে, রামদিন? আমরা রান্না আরম্ভ করেছি, আস্তে নাড়াচাড়া করতে বলো ড্রাইভারকে।"

"আপনি মজেসে রসুই করুন মাইজি, কুছ্ ভয় নেই"—বলিয়া রামদিন কাপলিংটা বসাইয়া দিল, ইঞ্জিন ধীরে ধীরে বাসা লইয়া চলিতে আরম্ভ করিল।

খানিকটা দূরে অন্য একটা লাইনে গাড়িটাকে দাঁড় করাইয়া ইঞ্জিনটি আবার এই লাইনে প্রবেশ করিল, কুমুদবন্ধুদের পাশের গাড়িটা জুড়িয়া আবার সেই ভাবে বাহির করিয়া লইয়া প্লাটফর্মের কাছাকাছি একটা লাইনে রাখিয়া আসিল। অন্য দুই-তিনটি লাইনে প্রবেশ করিয়াও গোটাকতক গাড়ি লইয়া ঐ রকম টানা-পোড়েন করিল ; ততক্ষণে রাত্রি হইল, রামদিনের ডিউটি শেষ হইয়া আসিল, পরের পয়েন্টস্‌ম্যান রামচরিত্তরকে কোথায় কোন্ গাড়ি যাইবে, কোন্ গাড়ি বাহির হইবে সব বুঝাইয়া দিয়া নিজের কোয়ার্টার্সে চলিয়া গেল।

৩

রাত্রি প্রায় নয়টার সময় এই মাস দুয়েকের অভ্যাসমত ইয়ার্ডের বিদ্যুতের আলো আর টর্চের সাহায্যে লাইন ডিঙাইয়া ডিঙাইয়া যথাস্থানে আসিয়া কুমুদবন্ধু সেজ ছেলের নাম ধরিয়া ডাকিলেন—"ওবিনেশ !"

অবিনাশ দোরের কাছে কিছু জিনিসপত্র থাকিলে সরাইয়া লইবে, তাহার পর কুমুদবন্ধু গাড়িতে উঠিবেন, এই হইতেছে প্রাত্যহিক ব্যবস্থা, কিন্তু কোন উত্তর পাওয়া গেল না। দারুণ শীতে, আপদমস্তক মুড়ি দিয়া হি-হি করিতে করিতে কুমুদবন্ধু আবার হাঁকিলেন—"ওবিনেশ, শুনছিস না। জিনিসগুলো সরিয়ে নে, উঠব—"

বন্ধ দরজা খুলিয়া উঠিতে যাইবেন, ভিতর থেকে একটি পশ্চিমা ছেলে বলিল—"ই গাড়ি নেহি।"

"তবে !"—বলিয়া কুমুদবন্ধু তিন হাত পিছাইয়া আসিলেন। ঠাহর করিয়া দেখিলেন এটা তাঁহার পাশের গাড়িটা, পাশাপাশি তিনটা আট-চাকার লম্বা গাড়ি ছিল, তাই ভুল করিয়া ফেলিয়াছেন দারুণ শীতের এই

জবড়জঙ্গ অবস্থায়। সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু শীত ছাড়িয়া গিয়া কালঘাম ছুটিল—তাহা হইলে তাঁহারটা কোথায়?

সেই ছেলেটিকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন—"আমারটা কোথায় তা হলে?"

"শান্টিংমে লে গিয়া।"

"কখন?"

"সামকো।"—অর্থাৎ সন্ধ্যার সময়।

"কোথায়? কোন দিকে? এখনও ফেরে নি কেন?"

ছেলেটি তিনটি প্রশ্নের কোনটিরও উত্তর দিতে পারিল না।

কিছুক্ষণ পর্যন্ত কুমুদবন্ধুর মুখ দিয়া কোন প্রশ্ন সরিল না। এরকম ব্যাপার এখানে কয়েকবার হইয়াছে, একবার তিনিও ভুক্তভোগী, কিন্তু সে কয়েক মিনিটের জন্য, হদ্দ আধঘণ্টা। অফিস হইতে আসিয়া দেখেন বাসা নাই, তাহার পর তখনই আবার পাইলট ইঞ্জিন রাখিয়া গেল। এ যে সন্ধ্যা থেকে উধাও, রাত ন'টাতেও দেখা নাই!

তৃতীয় গাড়িটা এক জন বাঙালীর, এক অফিসেই কাজ করেন, কুমুদবন্ধুবাবু সামনে গিয়া ডাকিলেন—"গোপেশবাবু!"

গাড়ির দরজা খুলিয়া গোপেশবাবু মুখ বাহির করিলেন।

"আমার গাড়ি পাওয়া যাচ্ছে না মশাই!"

"তার মানে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, শুনলাম সন্ধ্যের সময় শান্টিঙে নিয়ে গিয়েছিল—নিশ্চয় মিশিরজীর গাড়িটা বের করবার জন্যে, তাঁর তো বদলি হয়ে গেল,—সেই থেকে এখনও পর্যন্ত ফিরে আসে নি—সব নেশাখোরদের কাণ্ড, কারুর তো নজর নেই এদিকে—"

"কাছাকাছি ইয়ার্ডটা দেখেছেন?"

"না, দেখি নি এখনও, এই শুনলাম সুরুজপ্রসাদবাবুর ছেলের কাছে!"

"দাঁড়ান, আসছি।"

ওভারকোট, র‍্যাপার, কম্ফর্টারে আপাদমস্তক ঢাকিয়া গোপেশবাবু নামিয়া আসিলেন। দুই জনে কাছাকাছি সমস্ত ইয়ার্ড খুঁজিলেন, তাহার পর দূরেও। পণ্টেস্‌ম্যান, পাইলট ড্রাইভার দুই জনকে প্রশ্ন করিলেন; গাড়ির কিন্তু কোন হদিস পাওয়া গেল না। প্রায় ঘণ্টা দুয়েক হয়রান হইয়া অবশেষে ইয়ার্ডের এক প্রান্তে দেখা গেল একটি আট-চাকার গাড়ি একক দাঁড়াইয়া আছে। আশায় বুকটা ধড়াস করিয়া উঠিল, তাহার পর দুই জনে আগাইয়া নম্বরের উপর টর্চ ফেলিয়া দেখেন মিশিরজীর গাড়িটা। ডাকাডাকি করিয়া মিশিরজীকে তুলিলেন, খবর পাইলেন পার্সেল এক্সপ্রেসের পেছনে তাঁহার গাড়িটা আজ জুড়িয়া তাঁহার নূতন কর্মস্থানে পৌঁছাইবার কথা ছিল, কিন্তু জোড়ে নাই। কারণটা জিজ্ঞাসা করায় এই রেলওয়েটাকে একটা কুৎসিত গালাগাল দিয়া বলিলেন—কারণ তিনি জানেন না, শুধু এইটুকু জানেন এ রেলে সবই সম্ভব, যবে খুশি লইয়া যাইবে, তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছেন।

কি সর্বনাশ যে হইয়াছে বুঝা গেল। দুই জনে স্টেশনে ছুটিলেন। স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে দেখা করিয়া জানাইলেন—তাঁহার গাড়িটা ভুলক্রমে সাতটা বাইশের পার্সেল এক্সপ্রেসে যুক্ত হইয়া স্টেশন ছাড়িয়া গিয়াছে, সন্ধান লইয়া সেটাকে আটকানো দরকার। সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত বলিয়া গেলেন।

এ ধরণের বা এর চেয়েও গুরুতর এত ব্যাপার নিত্য হইতেছে এ-রেলে যে, স্টেশন মাস্টারের মুখে বিশেষ কোন ভাবান্তর দেখা গেল না। অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইয়া ডাকিলেন—"হ্যাল্লো, কনট্রোল!—"

সাড়া পাওয়া গেলে প্রশ্ন করিলেন—"সেভেন্টি-সিক্স ডাউন পার্সেল এখন কোথায়?—"

রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারটা, গাড়িটা সব জায়গায় ধরে না, চার ঘণ্টায় অনেকগুলি স্টেশনই পার হইয়া গিয়াছে, কনট্রোল একটু অনুসন্ধান করিয়া সঠিক অবস্থানটা জানাইল—রাস্তায় আছে আর মিনিট পাঁচেক পরেই একটা বড় স্টেশনে পৌঁছিবে।

স্টেশন মাস্টার ব্যাপারটা জানাইলেন—অমুক নম্বরের গাড়ি অমুক স্টেশনে যাইবার কথা, তাহার স্থানে ভুলক্রমে অমুক নম্বরের গাড়ি চলিয়া গিয়াছে, তাহাকে খুলিয়া লইয়া পরবর্তী এক্সপ্রেস বা কোন প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে জুড়িয়া পাঠাইয়া দিতে হইবে। নির্দেশটুকু দিয়া ফোন্ ছাড়িয়া তিন-জনে মুখোমুখি হইয়া বসিয়া রহিলেন। একটু যে গল্প হইল তাহাতে স্টেশন মাস্টার জানাইলেন—"ও গাড়ি এখন বিশ-বাঁও জলে।"

"কেন?"

একটু থামিয়া নিরুদ্বেগ কণ্ঠে বলিলেন—"এই দেখুনই না, এটা কি রেল ভুলে যাচ্ছেন যে, এর নামই পড়েছে ওল্ড টায়ার্ড—"

এমন সময় টেলিফোনটা বাজিয়া উঠিল, স্টেশন মাস্টার তুলিয়া লইয়া সাড়া দিলেন—"হ্যালো—ইয়েস—তাই নাকি?—তা হ'লে?—বেশ, পার্টি বসে আছেন ততক্ষণ—খোঁজ নিয়ে বলুন।"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া কতকটা বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন, সে গাড়ি পৌঁছোয়ই নি ও স্টেশনে। আপনাকে বললাম না?"

"পৌঁছোয় নি! তা হলে?"—কুমুদবন্ধু একেবারে ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন।

"থামুন, খোঁজ নিচ্ছে। এ স্টেশনে আবার গার্ডের বদলি হ'ল, আগেকার গার্ড রানিং-রুমে চলে গিয়েছে, তার কাছে লোক পাঠানো হয়েছে।"

"কিন্তু সে তো সমস্ত চার্জ বুঝিয়ে যাবে—"

"বোধ হয় এটা ছেড়ে গিয়েছে—রেলটা যে কি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি—এর আগেকার নাম রেখেছিল—বদমাইস, নালায়েক—"

এমন সময় টেলিফোনে শব্দ হইল—স্টেশন মাস্টার আবার তুলিয়া লইলেন—

"হ্যাল্লো—আচ্ছা—বেশ—আচ্ছা—আচ্ছা—"

টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া সেই রকম নিরুদ্বেগ কণ্ঠে জানাইলেন টেলিফোনে বলিতেছে—এ স্টেশন ছাড়িয়া পরের স্টেশনে পৌঁছাইতে গাড়ির শেষের দিকের মালগাড়ি থেকে একটা কান্নাকাটি হট্টগোল ওঠে। স্টেশনের সবাই জড়ো হইয়া টের পায়—এক গাড়ির বদলে অন্য গাড়ি জুড়িয়া লইয়া চলিয়াছে পার্সেলটা। গাড়িটাকে কাটিয়া সাইডিঙে রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। এদিকে ওমুখো আর গাড়ি নেই, একেবারে শেষ রাত্রির দিকে এক্সপ্রেস, তাহাতেই জুড়িয়া ফেরত দেওয়া হইবে।

আর কিছুই তাহা হইলে করিবার নাই। বেশি দূর নয়, এদিক থেকে ধরিলে ছয়টা স্টেশন পরেই, কিন্তু ডাউনেরও কোন গাড়ি নাই যে, কুমুদবন্ধু গিয়া পরিবারের সঙ্গে মিলিত হন। মালগাড়ি থাকিলেও চলিত, কিন্তু খবর পাইলেন যে তাহাও আর নাই ; একটা ছিল, মিনিট দশ হইল ছাড়িয়া গিয়াছে।

স্টেশন মাস্টার আর একটা খবর দিলেন। এই ধরণের দুর্ঘটনার সম্প্রতি বাড়াবাড়ি হওয়ায় এর জন্য অফিসে একটা বিভাগই খোলা হইয়াছে, সকাল ছয়টা হইতে বসে। এক্সপ্রেসে যদি মালগাড়িটা আসিয়া না পড়ে, কুমুদবন্ধু যেন অফিসেই খবর নেন, কেননা, সকাল থেকে স্টেশন কর্মচারীদের হাতে কাজের চাপ, ইচ্ছা থাকিলেও এই রকম টেলিফোন ধরিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। অফিসটার সন্ধানও দিয়া দিলেন।

কুমুদবন্ধু একটু ভীত ভাবেই বলিলেন—"সকালের এক্সপ্রেসে নিশ্চয় এসে পড়বে—"

স্টেশন মাস্টার শুধু একটু মুচকি হাসিলেন, বলিলেন—"এসে পড়ে ভালই, আপনাকে আর অফিসে দৌড়োতে হবে না।"

৪

এক্সপ্রেসটা পৌঁছিবার সময় পাঁচটা, সাড়ে সাতটায় আসিল। মালগাড়িটা নাই। কুমুদবন্ধু চারিটা থেকে আসিয়া বসিয়া আছেন, অবসন্ন শরীরে নূতন অফিসে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

একটি ছোট ঘব, মাঝখানে টেবিলের সামনে একজন অত্যন্ত স্থূল আধ-বুড়োগোছের ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, বাঙালীই। অন্য একটি টেবিলে মুখোমুখি হইয়া দুই জন পশ্চিমা ছোকরা কেবাণী, একজন টাইপিং লইয়া আর এক জন কতকগুলি কাগজপত্র লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত রহিয়াছে। শীতের সকাল, তায় নূতন অফিস, এখনও অনেকে সন্ধানই জানে না, তবুও কাউণ্টারে পাঁচ-সাত জন লোক ভিড় করিয়া রহিয়াছে।

কুমুদবন্ধু দরজার কাছে দাঁড়াইয়া বলিলেন—"আমি রেলেরই লোক, এই স্টেশনেই থাকি, ভেতরে আসতে পারি কি?"

"আসু-ন"—ভদ্রলোক টানিয়া কপাটা বলিয়াই কাশিতে আরম্ভ করিলেন, সেই অবস্থাতেই ডান হাতটা সামনের চেয়ারের দিকে বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। গলায় একটা কম্ফর্টারের ওপর র‍্যাপার জড়ানো, কাশিটা থামিলে দুটাকেই আরও টানিয়া দিয়া প্রশ্ন করিলেন—"কি ব্যাপার?"

"একটা বড় বিপদে পড়া গেছে—ইয়ে, পাকিস্থান থেকে এসেছি, আছি মালগাড়িতে, কাল সন্ধ্যেয় সেটা পার্সেল এক্সপ্রেসে—"

"টেনে নিয়ে গেছে?—প্রাতর্বাক্যে বলা ঠিক নয়, কিন্তু আর আশা নেই—"

"আশা নেই কি মশাই!"

ভদ্রলোক টানিয়া টানিয়া কথা বলেন, এদিকে একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ভাব লাগিয়া আছে, তুড়ি দিতে দিতে হাই তুলিলেন, তাহার মাঝখানেই কাশি আসিয়া পড়িল, সব শেষ হইলে বলিলেন—"আংমাবাম, লষ্ট্ ওয়াগন্‌স্‌কা ফাইল সব উতারো তো।"

কুমুদবন্ধু লক্ষ্য করিলেন অফিস নূতন হইলেও ফাইলের গাদা লাগিয়া গেছে এরই মধ্যে, এক জন কেরাণী উঠিয়া কাঠের র‍্যাক্ থেকে এক থাক নামাইয়া আনিল। ভদ্রলোক সেই রকম অলসকণ্ঠে বলিলেন—"ঐ!

দেখুন, বিশ্বাস না হয়—পঁয়ত্রিশখানা মালগাড়ি সমস্ত লাইনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মা-বাপ নেই—ক্লাসিফিকেশন, আৎমারাম—?"

"টেন্ উইথ্ ফ্যামিলি হুজুর, অলেভ্‌ন উইথ্ ফ্রেট্, ফোরটিন্ এম্‌পটি—"

"ঐ নিন—দশখানা আপনার মতন পরিবার নিয়ে, এগারখানায় মাল, বাকি খালি। —প্যাঁকাল মাছের মতন পিছলে পিছলে বেড়াচ্ছে সমস্ত লাইনে, ধরবার উপায় নেই, আজ খোঁজ পেলেন এই পাশের স্টেশনে, ধরবেন ক্যাঁক করে, কাল খবর এল একশ' মাইল দূরে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—"

হাই তুলিয়া কাশিয়া কম্ফর্টার র‍্যাপার টানিয়া দিয়া বলিলেন—"খেলে কচুপোড়া! বুড়ো বয়সে বাড়ি থেকে টেনে নিয়ে এসে এক ঘেঁড়া ন্যাতা হাতে দিয়ে—তারপর আর কিছু পেয়েছেন খবর, না ঐ পর্যন্ত?"

কুমুদবন্ধুর মুখ একেবারে শুকাইয়া গেছে, বলিলেন—"কাল রাত্তিরে খবর পাওয়া গেল এখান থেকে পাঁচটা স্টেশন আগে একটা সাইডিঙে পড়ে আছে—এদিককার নামগুলোও মনে থাকে না—পার্সেলের ফার্স্ট ষ্টপেজ আর কি—ঠিক ছিল সকালের এক্সপ্রেসে জুড়ে নিয়ে আসবে, তা আসে নি।"

ভদ্রলোক অলসভাবে টেলিফোনটা তুলিয়া লইলেন, ডাকিলেন—"হ্যালো কন্‌ট্রোল্!—" সাড়া পাওয়া যাইতে আগাগোড়া সমস্ত খবরটা দিয়া গেলেন। তাহার পর টেলিফোনটা রাখিয়া দিয়া বলিলেন—"খোঁজ নিচ্ছে।"

একটু যে সময় পাওয়া গেল তাহাতে নিজের দুঃখের কথা তুলিলেন—নাম অনুকূল ভাদুড়ী। রিটায়ার করিয়া বসিয়াছিলেন—ছোট মেয়েটির বিবাহ দিয়া এইবার দু'জনে কাশীবাসী হইবেন, আবার ডাকিয়া এই ফ্যাসাদ—হাতে আছে পাত্র-টাত্র একটা?—এই পেটে একটু বিদ্যে থাকে

—কিছু জমি-জমা—নেহাত চাকরির ওপরই না ভরসা—চাকরির সুখ তো দেখাই যাইতেছে—

এমন সময় টেলিফোন বাজিয়া উঠিল। তুলিয়া বলিলেন—"হ্যালো!—আচ্ছা—ঠিক—"

রাখিয়া দিয়া একটু বিজয়ের হাসি হাসিয়াই বলিলেন—"ঐ নিন্, যা বলেছিলাম—সে গাড়ি ও স্টেশনে আর নেই—"

"বলেন কি!—নেই?—আমি ভেবেছিলাম বুঝি ভুলে—"

"নেই।—তার কারণ হয়েছে, হাণ্ড্রেড্ টোয়েন্টি সিক্স ডাউন গুডস্ রাত আড়াইটের সময় শান্টিং করতে করতে ভুল করে তুলে নিয়ে গেছে।"

"তার পর!"

"কোন্ স্টেশনে ড্রপ করলে খবর পেতে দেরি হবে, এক এক করে জিগেস করবে তো?"

বহু দূরে দুইটা স্টেশনের নাম করিয়া বলিলেন, মালগাড়িটা এখন সেই দুইটার মাঝখানে, ঘণ্টা দুয়েক তার কোন খবর নাই, হয়তো ইঞ্জিন ফেল করিয়া মাঝপথে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহার পর একটু নিম্ন কণ্ঠে বলিলেন—"ফেলই কি করে সব সময় মশাই? মাঝপথে দাঁড় করিয়ে এটা ঠুকছে ওটা ঠুকছে, ওদিকে ওয়াগন্‌কে ওয়াগন্ খালি করে মাল সরিয়ে নিচ্ছে—ট্রিক্‌স!—আমরাই কিছু করতে পারলাম না।"

উপায় নাই, একবার অফিসে বাহির হইবার সময় এদিক হইয়া যাইতে বলিলেন—যত দূর সম্ভব খোঁজখবর লইয়া রাখিবেন। মেয়ের বিবাহের কথাটা মনে রাখিতে বলিলেন—"আমরা হলাম ভাদুড়ী—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ—বাগচি, সান্ন্যাল—মানে ভাদুড়ী ছাড়া আর যা হয়—ছেলেটির যেন খাওয়ার-পরবার একটু সংস্থান থাকে—"

এগার দিন হইয়া গেছে গাড়ির কোন সন্ধান নাই ; ঠিক যে সন্ধান নাই এমন নয়, পাওয়া যাইতেছে খবর, সব ব্যবস্থা ঠিক, আবার কি করিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে, আজ এক জায়গায়, কাল হয়ত দেড়শ' মাইল দূরে। দিদির কাছ থেকে খান তিনেক চিঠিও পাইলেন, হতাশায় ভরা, আর গালাগালি—রেলওয়েকে, আর এমন রেলওয়েতে কাজ করার জন্য কুমুদবন্ধুকেও।

কুমুদবন্ধুও একেবারে আশা ছাড়িয়া দিয়াছেন। বার দুয়েক সব ঠিকঠাক করিয়া নিজে পর্যন্ত গিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার আগেই গাড়ি উধাও হইয়াছে, একেবারে সামনের দিকেই, একবার এদিকে আসিয়া পাশের একটা জংশন স্টেশন হইয়া ব্রাঞ্চ লাইনে ঢুকিয়া পড়িয়াছে।

হতাশায় হতাশায় এমন অবস্থা হইয়াছে যে একটা বিশ্বাস দাঁড়াইয়া গেছে আর ইহজন্মে পাওয়া যাইবে না। দিনে তিন-চারবার করিয়া অফিসে যান, খোঁজ পান অমুক স্টেশনে রহিয়াছে, তাহার পর আবার নিরুদ্দেশ ; অনুকূলবাবু নির্বিকার কণ্ঠে মেয়ের জন্য পাত্রের কথা তোলেন। সর্বোচ্চ অফিসার পর্যন্ত চিঠি লিখিয়া লিখিয়া হয়রান হইয়া গেছেন, সবগুলো অনুকূলবাবুর অফিসে আসিয়া জমা হয়। এদিকে ফাইলের সংখ্যাও পঁয়ত্রিশ থেকে বিয়াল্লিশে গিয়া দাঁড়াইয়াছে। কাউন্টারে লোকদের ভিড়, গুলতন গেছে বাড়িয়া।

মরিয়া হইয়া এক ঝোঁকে গাড়ির সন্ধান লইতে লইতে এক নাগাড়ে পাঁচ দিন সমস্ত লাইনটা এমুড়ো ওমুড়ো চষিয়া ফেলিলেন, ধরা গেল না।

পশ্চিমের শীতে, অনিয়মে শরীর ভাঙিয়া গিয়াছে, আবার হেড কোয়ার্টারে ফিরিয়া আসিলেন।

তাহার পর ব্যাপারটা চরমে আসিয়া ঠেকিল।

একদিন নিজের অফিসে চেয়ারে বসিয়া চিন্তা করিতেছেন, পাশের সঙ্গী কেরাণীরা যখন যাহার অবসর হইতেছে সান্ত্বনা দিতেছে—গাড়ি যখন লাইনের ওপর আছে, ভয় কি?—একদিন না একদিন পাওয়া যাইবেই—এ তো সমুদ্র নয়, কোথায় ঝড়ে ডুবিল, কোথায় পাহাড়ে ঠোক্কর লাগিল—এ যতই কিছু হোক, বাঁধা লাইন ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না—ঐ তো পাঞ্জাবে পরিবারকে পরিবার নষ্ট হইয়া গেল, এ তো তাহার চেয়ে ঢের ভাল—ধরা যাক, যদি নাই আর দেখা হয়, বাঁচিয়া তো থাকিবেই সবাই—

এমন সময় অনুকূলবাবুর পিয়ন আসিয়া খবর দিল, বাবু সেলাম দিয়াছেন।

কাশিতেছিলেন, সেই অবস্থাতেই দক্ষিণ হাতটা বাড়াইয়া বসিতে ইঙ্গিত করিলেন। বেগটা থামিলে র‍্যাপার আর কম্ফর্টার ভাল করিয়া জড়াইয়া লইয়া বলিলেন—"নিন মশাই, টেনে তুলেছি, এ সব ব্যাপারে অত হেলুলে চলে? এইবার গিন্নী এসে পৌঁছুলে একটা ভোজ দিয়ে দিন—"

নিজের রসিকতায় হাসিতে গিয়া আবার একচোট কাশি আসিয়া পড়িল।

কুমুদবন্ধুবাবু ব্যাকুল আগ্রহে প্রশ্ন করিলেন—"এসে গেছে?"

"এসে গেছেই বলতে পারেন; টু ডাউন এক্সপ্রেস নেক্সট্ ষ্টেজ থেকে তুলে নিয়ে ষ্টার্ট করেছে—মাঝে পাঁচটা স্টেশন—"

ঘড়িটা দেখিয়া বলিলেন—"আর আধ ঘণ্টার মধ্যে এসে পড়বে—"

"তা হলে উঠি আমি—"

"আরে বসুন, আধ ঘণ্টা বললাম বলে কি আধ ঘণ্টাই ভেবেছেন নাকি? হয় তো শুনবেন কোথাও ইঞ্জিন ফেল করে বসে আছে, কিম্বা কোন স্টেশনে লাইন ক্লিয়ারই পায় নি, ছিলেন বি.এ. আর-এ, এসব কাণ্ড তো জানা নেই।—পেলেন পাত্রের খোঁজ? মেয়েটিকে তো আর রাখা যায় না; এই দেখুন না, গিন্নী যা চিঠি লিখেছেন তাতে পতি-গুরুর গুরুত্ব আব কিছু রাখেন নি। আমরা হলাম ভাদুড়ী—ঐটুকু মনে রাখতে হবে, বাগচি, সান্ন্যাল—"

কোন রকমে মুক্ত হইয়া স্টেশনে আসিয়া দেখেন গার্ডের গাড়ির দিকে একটা তুমুল জটলা, এক রকম ছুটিতে ছুটিতে গিয়াই উপস্থিত হইলেন।

ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গিয়া দেখেন একটা রেলের সাঁওতালী কুলীর পরিবার, মেয়ে, মাগী, আণ্ডাবাচ্চা মিলাইয়া আট দশজন; বলা নাই, কওয়া নাই, তাহাদের নিজের স্টেশন থেকে টানিয়া আনিবার জন্য একধার থেকে সবাই মিলিয়া অকথ্য ভাষায় গালাগাল দিতেছে, একটা লোক কাপলিংটা খুলিয়া গাড়িটাকে ছাড়াইয়া লইতেছে।

অফিসে আসিয়া খবর পাইলেন, সেই স্টেশনেই আপ্ পার্সেল এক্সপ্রেসটা দাঁড়াইয়া ছিল, টু ডাউন পৌঁছিবামাত্র কুমুদবন্ধুর গাড়িটা জুড়িয়া লইয়া উল্টা দিকে চলিয়া গিয়াছে।

৬

শরীর গেছে, মন দিন দিনই ভাঙিয়া পড়িতেছে; ওদিকে কুড়ি বৎসরের তিল তিল করিয়া সঞ্চয় করা সম্পত্তি নষ্ট হইল, তাহার পর এই —একেবারে মূলে হাবাত। বৈরাগ্য অনেক দিন থেকেই প্রবেশ করিয়া ছিল মনে, ক্রমে ক্রমে উগ্র হইয়া উঠিল।

আর অনুকূলবাবুর অফিসেও যান না, নিজের অফিসে গিয়া টেবিলের সামনে বসিয়া সান্ত্বনা শোনেন, ছুটি হইলে উঠিয়া আসেন। ওয়েটিং-রুমের একটা কোণে পড়িয়া থাকেন, হোটেলে নেহাত প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এক মুঠা খান।

দিন আষ্টেক পরের কথা। এক জন সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাইয়াছেন কুমুদবন্ধু, তিনি তত্ত্বজ্ঞান দিয়াছেন, সমস্ত জীবনটাই এই রকম বৃথা অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ানো; ঠিক হইয়াছে সব ত্যাগ করিয়া এই দিক দিয়াই গিয়া হিমালয়ে উঠিবেন। কাজে ইস্তফা দিয়া সকাল সকালই অফিস হইতে বাহির হইয়া গেটের কাছে আসিয়াছেন, ডাক পিয়ন প্রবেশ করিতেছিল, হাতে একটা চিঠি দিল, খামের ওপর অনেকগুলি মোহরের ছাপ। কুমুদবন্ধু তাড়াতাড়ি চিঠিটা খুলিয়া পড়িলেন—

পার্বতীপুর
সোমবার

আশীর্বাদ জানিবা,

আমরা অনেক কষ্টে তিন দিন হইল এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি। বাড়ির চারখানা দরজা আর দুইটা জানালা খুলিয়া লইয়া গিয়াছে; তাহার পরই পাড়ায় পুলিস মোতায়েন হয়, আর কিছু করিতে পারে নাই। এখানে আর হাঙ্গামাও কিছু নাই; শোনা যাইতেছে এখানকার মুসলমানদের সঙ্গে পশ্চিমা মোছলাদের বনিতেছে না। কাল কলিমুদ্দি আসিয়া অনেক দুঃখ করিল—বলিল—মা ঠাকরুণ, যখন এয়েছেন আর যাবেন না, ওরা আপনাদের তাড়িয়ে—আমাদেরও তাড়াবে। কলিমুদ্দির ছেলে তো কালেজে লেখাপড়া করিতেছে, সে-ই নাকি ভেতরের কথা টের পাইয়া এই সব বলিয়াছে।

আমায় চিঠি লিখিয়া দিল অম্বিকার ছেলে ললিত। উহারাও

আসাম থেকে ফিরিয়া আসিয়াছে। বলে তাদের চেয়ে ঘরের মুসলমান ঢের ভাল। তারা বাঙালীকে একেবারে পছন্দ করে না।

যাই হোক, তুমি পত্রপাঠই ইস্তফা দিয়া চলিয়া আসিবে, আর ও মুখের চাকরিতে কাজ নাই—যা আছে তাহাতেই চলিয়া যাইবে। আমরা কি করিয়া পরিত্রাণ পাইয়া পলাইয়া আসিয়াছি এক ভগবানই জানেন, চিরদিনই বোধ হয় রেলে রেলে ঘুরিতে হইত।

আমরা শরীর গতিকে ভাল। ফসল ভাল হইয়াছে, কলিমুদ্দি, পাঁচু সেখ, জয়নাল, সাতকড়ি মণ্ডল সবাই বলিতেছে আমাদের অংশ আমরা পাইব।

তুমি চলিয়া আসিতে বিলম্ব করিবা না। পুনরায় আশীর্বাদ জানিবা। ইতি—

আশীর্বাদিকা
দিদি

কলিকাতায় আমাদের পাড়ায় মায়ের আবির্ভাবের কাহিনীটা কতক কতক চালু আছে এখনও ; বিশ্বাস জিনিযটা এমনই যে —

যাক্ গল্পটাই বলি। দাঙ্গার সময়কার কথা। যে-কোন সময় যে-কোন জায়গায় একটা কাণ্ড ঘটিয়া যাইতে পারে, জীবনটা যে সত্যই বুদ্বুদ শঙ্কর-বুদ্ধও এত পরিষ্কার করিয়া বুঝাইতে পারেন নাই। দূরে কাছে, যখন-তখন জয় হিন্দ ! আল্লা হো আকবর ! বন্দেমাতরম্ ! কথাগুলার মানে বদলাইয়া গেছে, সেই মাতালটার কথা মনে পড়ে—বেটারা মধুর হরিনামকে তেতো করে দিলে !

ওর মধ্যে আবার বিবাহ আছে, পূজা আছে, যাত্রা-থিয়েটার আছে ; সিনেমা আছে, জীবন-বুদ্বুদ যতটুকু থাকে একটু আলোর ঝিকিমিকি মাখিয়া থাকিতেই চায়।

যেখানেই দেখ ঐ এক আলোচনা। লোকে চলিতে চলিতে যেন জট পাকাইয়া যাইতেছে—গলিতে, ফুটপাথে, পার্কে ; চারিদিককার খবর আসিয়া জুটিতেছে—সত্য, কাল্পনিক। আবার জট খুলিয়া যে-যার কাজে-অকাজে চলিয়া গেল। চাপা আতঙ্ক, সেইটাই আবার মত্ত স্লোগানে রূপান্তরিত হইয়া উঠে—জয় হিন্দ ! আল্লা হো আকবর ! ভয়-ভরসায় চলে মাখামাখি।

এ ভিন্ন পাড়ায় পাড়ায় দল আছে, রীতিমত কুচকাওয়াজ, ডিসিপ্লিন্ ; অস্ত্র সংগ্রহ। অবশ্য আত্মরক্ষার ওজুহাতেই, তবে সেটা প্রধানতঃ ওজুহাতই। আমাদের পাড়ার দলটা আড্ডা করিয়াছে দত্তদের বৈঠকখানায়। দত্তরা ফেরার, একটা নেপালী দারোয়ানের হাতে চাবি,

বেশ ভাল করিয়া তাহাকে দলের মধ্যে টানিয়া লইয়াছে। সবাই হাবিলদার সাহেব বলিয়া ডাকে। এ খেতাবটা যে ওর পূর্ব্ব থেকেই ছিল এমন তো শুনি নাই ; মানে, দস্তুরমত মিলিটারি কাণ্ড। ও. সি., মেজর, হাবিলদার, ক্যাপ্টেন—কিছুই বাদ নেই।

যেমন সব ক্ষেপিয়াছে, একটু যোগসূত্র ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করি। মাঝে মাঝে ঘরটাতে গিয়া বসি। নিজেদের নাম দিয়াছে সঙ্কটত্রাণ সমিতি ; খবর লুকায়, তবু বুঝি অপরের সঙ্কট কম বাড়াইতেছে না। উপায় নাই, ওদিককার কাণ্ড শুনিয়া এক এক সময় নিজেদের রক্তই গরম হইয়া উঠে। তবুও গিয়া বসি মাঝে মাঝে, বোঝাই, যতটা ঠাণ্ডা থাকে।

বাড়িয়াই চলিতেছে, তাহার পর সেদিন সকাল থেকে গুজব রটিল ওদিককার ওরা লীগ গবর্ণমেণ্টের উস্কানি পাইয়াছে, সেই দিনই আমাদের পাড়ায় আক্রমণ চালাইবে।

তুমুল উত্তেজনায় কাটিতে লাগিল দিনটা ; যতই কিছু না হইতে লাগিল, মনে হইল খুব গুরুতর রকমের কিছু একটা ঘটাইবার জন্যই ওদিকে সময় লইতেছে। সমস্ত পাড়াটা সমিতির ছেলেদের উদ্যোগে অস্ত্রেশস্ত্রে প্রস্তুত হইয়া উঠিল, ক্রমেই অধিক অধিক ভাবে। এর যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল সেইটাই আশঙ্কা করিতে লাগিলাম—অর্থাৎ ওদিক থেকে যদি কিছু না হয়, এই আয়োজনের বিপুলতার চাপে এরাই শেষ পর্যন্ত মারমুখো হইয়া উঠিবে। ব্যাপারটা ক্রমেই আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইতে লাগিল।

সমস্ত দিনটা কিছু হইল না। সন্ধ্যার পর পাড়াটা হঠাৎ কেমন যেন থমথমে হইয়া পড়িল। লক্ষণটা ভাল বোধ হইল না। সমিতিই সমস্ত পাড়াটার কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ন্ত্রিত করে, প্রতিটি কণ্ঠের স্লোগানটুকু পর্যন্ত। হঠাৎ এমন নিস্তব্ধ ভাবটা কেমন যেন অস্বস্তিকর বোধ হইল। একটু খোঁজ লওয়া দরকার।

দত্তদের বৈঠকখানায় গিয়া দেখি বেশ ভরা ঘর। একটা, কি চাপা মন্ত্রণা চলিতেছিল, আমি গিয়া পড়িতে সবাই একটু তটস্থ হইয়া পড়িল। আর চাপাচাপি করা চলে না, প্রশ্ন করিলাম—"সন্ধ্যের পর একটু যেন অন্য ভাব দেখছি আজ; ব্যাপারখানা কি—বলতে আপত্তি আছে?"

দু'একটা কণ্ঠে "আজ্ঞে—আজ্ঞে" করিয়া একটু কুণ্ঠার ভাব, তাহার পরই সমিতি মুখর হইয়া উঠিল—"ওপক্ষের ওরা আজকে জুৎ করতে পারে নি, তাই এগুল না—অথচ আজ যদি কোন রকমে টেনে আনতে পারি—উইক কিনা—একটিকে ফিরে যেতে দেব না—আজ্ঞে, তাই একটু ঘাপটি মেরে ঠাণ্ডা হয়ে থাকা—বাছাধনেরা যখন দেখবে—"

কথাবার্ত্তার মধ্যেই ঝমঝম্ ঝমঝম্ করিয়া একটা আকস্মিক শব্দে সবাই চকিত হইয়া উঠিলাম; এক লহমা, তাহার পর ঘর ফাটাইয়া সবাই একসঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল—"জয় হিন্দ!"

আমার কণ্ঠও মিশিয়াছিল।—বুড়ারা ছেলেদের টানিতে পারে না, ছেলেদের আকর্ষণই বড়।

বাহিরে আসিয়া সবাই অপ্রতিভ হইয়া পড়িলাম, এক ঝলক হাসিও উঠিল উছলাইয়া—দুইটা গলি পরেই জেলে আর গোয়ালাদের মিশ্র বস্তি। আওয়াজটা সেইখান হইতেই উঠিয়াছে—কি উপলক্ষ্য করিয়া সেটা পরে আপনি প্রকাশ পাইবে বলিয়া এখানে আর লজ্জার মাথা খাইয়া উল্লেখ করিলাম না।

ঘরে আসিতে আসিতে নানা কণ্ঠে মন্তব্য শুনিতে লাগিলাম—"ওরাই পারে—ওদেরই মানায়—সমস্ত দিন ঐ কাণ্ড করে, সন্ধ্যার পর যদি একটু এই রকম করে গা না এলায় তো বাঁচবে কি করে?—আর একা নয় তো, মেয়ে-পুরুষে লেগে গেছে—কচুকাটা করছে—আর সত্যিই তো, মেয়েদের আর ঘোমটা টেনে বসে থাকা চলে?—

ঘরে আসিয়া আবার পলিসির আলোচনা চলিল।—লোক বাড়িতে

লাগিল, নূতন নূতন খবর আসিয়া পড়িতে লাগিল—ভবানীপুর, বালিগঞ্জ, খিদিরপুর। এদিকেও চর পাঠানো হইয়াছে—কেহ ফিরিয়া রিপোর্ট দিল, কাহারও ফিরিতে এত দেরি হয় কেন? মাঝে মাঝে দলের ছেলেরা উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছে। একজন একজন করিয়া তাহাদের সন্ধানেও আরও জন চারেক রওনা হইয়া গেল।--বিষাদের আবহাওয়া, তবুও ছেলেগুলার বুকের পাটা দেখিয়া আনন্দ হয় বৈ কি।

ঘণ্টাখানেক কাটিয়া গেল। বসিয়া আছি, বসিয়া থাকিয়াই যতটুকু সংযত রাখা যায়। নিখোঁজ সঙ্গীগুলার জন্যই উত্তেজনাটা বাড়িয়া যাইতেছে ক্রমে ক্রমে; জাপানীদের মত সুইসাইড্ স্কোয়াড বা আত্মঘাতী বাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—চারি জন গিয়াছিল: আরও দুই জন চঞ্চল হইয়া উঠিল; কোনমতেই রোখা গেল না।

মৃদু 'জয় হিন্দ' ধ্বনির সঙ্গে তাহাদের বিদায় দিবে এমন সময় আগে যাহারা গিয়াছিল তাহাদের মধ্যে দুই জন উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া আসিল এবং প্রবল হাঁপানোর মাঝে কিছু বলিয়া উঠিতে পারার আগেই পাড়াটার উত্তর-পূর্ব্ব দিক মথিত করিয়া একটা তুমুল কলরব উঠিল—আল্লা হো আকবর!

সমস্ত দলটা একটু চকিত হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িল—নিশ্চয় আগে যে একটা ধোঁকা খাইয়াছে সেই স্মৃতিতেই। তাহার পর কিন্তু আর কাহারও কোন সন্দেহ রহিল না। ঘরের মধ্যে অস্ত্র সাজানো, অত ক্ষিপ্রতার মধ্যেও একটু গোলমাল হইল না, নিজের নিজেরটি তুলিয়া লইয়া সবাই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ছুটিল।

ঘরটা খালি হইয়া গেল, রহিয়া গেলাম শুধু আমিই। অস্ত্রও নাই, শরীরে ওদের মত স্নায়ুর ক্ষিপ্রতাও নাই, আছে বয়োধর্মের যা সম্বল—বিবেক, বিবেচনা, একটু থিতাইয়া জিরাইয়া চারিদিক ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখা।

মনস্থির করিয়া বাড়ী হইতে একটা পিস্তল লইয়া বাহির হইতে মিনিট পনের হইয়া গেল। ডোবা ভরাট করা একটা পড়তি জায়গা, সেইখানেই কাণ্ডটা হইয়াছে। যখন পৌঁছিলাম তখন ওদিককার ওরা পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে, চঞ্চল জনতার মধ্যেই এর-ওর মুখে শুনিলাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে কয়েকজনকে রাখিয়াই। তাহাদের অবশ্য সন্ধান পাইলাম না।

হঠাৎ পড়্তি জমিটার একদিকে একটা তুমুল কলরব উঠিল—"মা!—মা!—মা!—মা এসেছেন!—জয় মা!—"

সবাই সেই দিকে ছুটিল। যেন চাকের গায়ে মৌমাছি জমিয়া উঠিল, আর ঐ শব্দ—আকাশ যেন মথিত হইয়া যাইতেছে। ভিড় চিরিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে বিস্ময়ে একেবারে বাক্‌রোধ হইয়া গেল। কল্পনাতীত ব্যাপার।

একটি স্ত্রীলোক। আমি পিছনের দিকটায় গিয়া দাঁড়াইয়াছি, ভাল দেখিতে পাইতেছি না, তবুও অদ্ভুত! স্ত্রীলোকটির পরিধানে একটা টক্‌টকে রাঙা চেলি, কতকটা মহিষমর্দ্দিনীর মতই গাছকোমর করিয়া পরা। মাথায়, কপালের খানিকটা লইয়া লাল সালুর মতো একটুকরা কি শক্ত করিয়া বাঁধা! তাহারই মধ্য দিয়া আলুলায়িত কুন্তলের একটা রুক্ষ গুচ্ছ দক্ষিণ বাহুর উপর লুটাইয়া পড়িয়াছে। পাশ দিয়া যতটা দেখা যায় মুখের চোয়ালটা কঠোর, কতকটা পুরুষালিই, হাতটা পেশীবহুল, করতল রক্তবর্ণ; আমার সামনেই পায়ের পাতাটা উল্টাইয়া রহিয়াছে, পেলব নয় মোটেই, তবে সমস্তখানি আলতায় রাঙা, ধূলায় যা একটু মলিন করিয়াছে।

সবচেয়ে যা বিস্ময়কর—রোমাঞ্চকর বলাই ঠিক—রমণী একটা

গুণ্ডাকে চিৎ করিয়া ফেলিয়া তাহার নাভিকুণ্ডের উপর ডান হাঁটুটা চাপিয়া দুই হাতে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া যাইতেছে। গুণ্ডাটার মুখটা শ্মশ্রুবহুল হওয়ায় সমস্ত দৃশ্যটা এমন নিখুঁতভাবে মহিষমর্দ্দিনীর চিত্রের মত হইয়া উঠিয়াছে যে সত্যই সমস্ত ইন্দ্রিয় যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। লোকটাকে দেখিলে মনে হয় তাহার আয়ু প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে।

কিছুক্ষণ মাথায় কিছুই বুদ্ধি আসিল না, তারপর হঠাৎ কানে গেল—"মা! মা! এই নাও, শেষ করে দাও মা"—সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র জনতার একটা উল্লসিত চীৎকার—"জয় মা!"

ঘুরিয়া দেখি একটি যুবকের হাতে একটা ছোরা। হুঁস হইল, একরকম লাফাইয়া গিয়াই তাহার হাত হইতে সেটা কাড়িয়া লইলাম।

ঐতেই বুদ্ধিটা ফিরিয়া আসিল কতকটা, বলিলাম, "দেখছ কি? তোল ওঁকে, ছাড়িয়ে দাও—"

নিজেই গিয়া হাতটা ধরিলাম। খানিকটা নিশ্চয় আমারও ঘোর আসিয়া গেছে, তা ভিন্ন স্ত্রীলোকই তো, বলিলাম, "মা, যথেষ্ট হয়েছে—ছেড়ে দাও, দয়া কর, তুমি যে কারুর মা-ই সেইটুকু মনে কর—"

অসীম ক্ষমতা শরীরে, আর যেন সংহারের নেশায় মাতিয়া গেছে; তবে কি মনে হওয়ায় আমার দেখাদেখি আরও কয়েক জনে আসিয়া ধরিয়া ফেলিল।

পড়তি জমির নিতান্ত অপ্রচুর আলোকে যতটা সম্ভব চেহারাটা ভাল করিয়া দেখিলাম! বিকট, মসীকৃষ্ণ বললেও অত্যুক্তি হয় না, কোনখানে এতটুকু রমণী-সুলভ মাধুর্য্যের অবশেষ নাই। শুধু চক্ষু দুইটি বিশাল, আয়ত; তাহাও কিন্তু ললাটের নিম্নে অগ্নিপিণ্ডের মত ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে। আরও যা—কি বলিব?—ভাষা পাইতেছি না—আরও যা ভীষণ, রহস্যময়—মুখে অল্প অল্প সুরার গন্ধ! কিন্তু কোন

কথা নাই, ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত স্ফীত নাসারন্ধ্রের মধ্যে দিয়া যে একটা সাঁ সাঁ শব্দ বাহির হইতেছে—শব্দের মধ্যে মাত্র সেইটুকু।

"মা-মা!" শব্দ গগন ভেদ করিয়া উঠিতেছে। ভিড় আরও চাপ বাঁধিয়া উঠিতেছে। কি করা যায়? বুদ্ধি কাজ করিতেছে না।

হঠাৎ চৈতন্য হইল, সমিতির দু'চারজন অগ্রণীকে বলিলাম, "ভুল হয়ে যাচ্ছে—ভিড় সরাও, দাঙ্গার জায়গা এখুনি পুলিস এসে পড়বে।"

"ওঁকে? মাকে?"

"ওঁকে দত্তদের বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি—শীগ্‌গির ভিড় পাতলা কর—"

খুবই শক্ত ব্যাপার, সাক্ষাৎ মা কালীর অবতরণ হইয়াছে, লোকে মত্ত উল্লাসে যেন দিশাহারা হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মহলা দিয়া দিয়া ছেলেরা পোক্ত হইয়া উঠিয়াছে, চমৎকার নিয়মানুবর্ত্তিতা—দেখিতে দেখিতে সমিতির ছেলেরা ছাড়া সমস্ত ভিড়টা প্রায় পরিষ্কার হইয়া গেল —কতকটা ভয়ে, কতকটা আবার ইহাদের দাবেও। ফিল্ড হাসপাতালও আছে, গুণ্ডাটাকে সেইখানে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া স্ত্রীলোকটিকে মাঝে করিয়া দত্তদের বৈঠকখানায় লইয়া আসিলাম। আপত্তি মোটেই করিল না, তবে একটা কথাও বলিল না। অত্যন্ত অন্যমনস্ক, যেন অন্য কোন্ লোকে রহিয়াছে, শুধু স্ফুরিত নাসারন্ধ্র দিয়া ব্যর্থ আক্রোশের চাপা গর্জ্জন আসিতেছে বাহির হইয়া।

জায়গাটা থেকে দত্তদের বাড়ী বেশ খানিকটা দূরে, গোটাকতক গলি দিয়া বাঁকিয়া ঘুরিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সবাই নিস্তব্ধ, একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছে; হিন্দুরই মন তো। প্রথমে যাই ভাবি, সময় পাইয়া আমি সে বিশ্বাসটা অবশ্য কাটাইয়া উঠিয়াছি। তবে সাক্ষাৎ মা কালী না আসুন, একটা বিপন্ন জাতির উদ্ধারের জন্য মানুষের মধ্যেও তো দৈব শক্তির আবির্ভাব হয়—জোয়াঁ অব্ আর্কের মধ্যে ইতিহাসই যে তাহার সাক্ষ্য দিতেছে—হয় তো ইনি কুমারী নন, তা

সবাইকেই যে কুমারী হইতে হইবে তাহার মানে কি ?—শক্তির আধার কি এক রকমই ?

বৈঠকখানায় আনিয়া একটি সোফায় বসাইলাম। বলিলাম—"এবার শীগগির এঁর একটু আহারের ব্যবস্থা কর।"

একটি ছোকরা চাপা গলায়, তবুও যাতে স্ত্রীলোকটির কানে যায়, এই ভাবে বলিল—"ভোগ বলুন স্যার।"

বলিলাম—হ্যাঁ, ভুল হয়েছে, ভোগই—শীগ্‌গির দেখো, ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন।"

এতক্ষণ পরে স্ত্রীলোকটি একটু মুখ খুলিল, খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে বলিল—কিম্বা—যেন এই রকম শুনিলাম—"মাংস।"

সমস্ত ঘরটা আবার নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আমারও বুদ্ধি আবার লুপ্ত হইয়া আসিতেছে,—এ কি আহারের আদেশ! কতকটা বিমূঢ় ভাবেই বলিলাম—"মা স আনো—মাংস।'

সেই ছেলেটি সেই ভাবে প্রশ্ন করিল—"বলির ব্যবস্থা করি ?"

সকলেই একবার মুখের পানে চাহিল, মূর্ত্তি শুধু না'র ভঙ্গিতে একবার মাথাটা ঈষৎ নাড়িল।

আমার বুদ্ধি মাঝে মাঝে ফিরিয়াও আসিতেছে একটু একটু, বলিলাম -"চপ কাটলেট, কোর্ম্মা—এই রকম—শীগ্‌গির—হোটেল থেকে—"

মুখের পানে চাহিয়া দেখিলাম আপত্তির কোন ইঙ্গিত নাই। জন-পাঁচেক ছেলে এক রকম ছুটিয়াই বাহির হইয়া গেল।

এমন সময় একটা কাণ্ড হইল। ঘরে তো তিল ফেলিবার জায়গা নাই, বাহিরের বারান্দাটাও গেছে ভরিয়া ; গোটাছয়েক জানলা সামনের দিকে—তা এক একটাতে রাশীকৃত কৌতূহলী মুখ গরাদ চাপিয়া আছে,

দরজাটা একেবারে ঠাসাঠাসি। তবে এক চাপা 'মা-মা' ছাড়া কোন শব্দ নাই।

এমন সময় হঠাৎ গলিতে একটু দূরে একটা কচি গলার কান্না উঠিল এবং পরক্ষণেই বোঝা গেল ছেলে বা মেয়ে যেই হোক, দৌড়াইয়া দৌড়াইয়া যেন এই দিকেই আসিতেছে।

আবার একটা ত্রস্ত গুঞ্জন উঠিল ঘরটাতে, একটা সচকিত ভাব, বলিলাম—"দেখতো—কাঁদে কেন?"

তাহার আগেই চার-পাঁচ জন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেছে। একটু পরেই একটা ছেলেকে ধরাধরি করিয়া আনিয়া বারান্দার প্রান্তে দাঁড় করাইল। আমি দরজার কাছে আগাইয়া গেলাম। ভিড় দু'পাশে, একটু সরিয়া দাঁড়াইতে দেখি এও এক অদ্ভুত ব্যাপার—অলকা-তিলকা আঁকা, ধড়া-চূড়া পরা একটি আট নয় বছরের শ্রীকৃষ্ণ, তাহার কান্নাও তখন স্পষ্ট—"জেঠামশাই! জেঠামশাইকে দেখব—আমার জেঠামশাইকে মেরে ফেলেছে!"

"কোথায় ছিল তোর জেঠামশাই?"

ততক্ষণে তাহার দৃষ্টিটা ভিতরের দিকে পড়িয়া যাওয়ায় হঠাৎ যেন আড়ষ্ট হইয়া চুপ করিয়া গেল। তাহার পর মূর্তিটার দিকে দেখাইয়া বলিয়া উঠিল—"ঐ তো, ও জেঠামশাই গো।"

একটু নিস্তব্ধতা: সবাই বুঝিল বেচারার মাথা বিগড়াইয়া গেছে।

কয়েকজন ঘিরিয়া বলিল—"ও তো মেয়েছেলে, দেখছিস—কাঁদিস নি খুঁজে বের করছি তোর জেঠামশাইকে—ঠাণ্ডা হ' দিকিন।'

"না, মেয়েছেলে নয়—আমার মা—ছেড়ে দাও আমায়—"

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন নেশাখোর গোছের লোক খিঁচাইয়া উঠিল—"একবার মা, একবার জেঠামশাই—বেটা, মাথা খারাপ হয়েছে তো না হয় বাবাই বল্—একটা লোককেই ভাসুর আর ভাদ্দরবৌ।"

মূর্ত্তি মাথাটা হেঁট করিয়াই বসিয়াছিল, আরও নামাইয়া লইয়াছে। আমি যে এতক্ষণ কথা বলি নাই তাহার কারণ আছে—মাথাটা ধীরে ধীরে পরিষ্কার হইয়া আসিতেছে। আগাইয়া গিয়া বলিলাম—"ছেড়ে দাও ওকে—ব্যাপারটা কি রে? এদিকে আয় তো, বল্ খুলে, ভয় নেই—"

ফোঁপাইতে ফোঁপাইতে এবং তাহারই মধ্যে আড়াল দিয়া কতকটা ভয়ে এবং কুণ্ঠায় মূর্ত্তিটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে বলিল—"জেঠামশাই-ই তো—যাত্রায় মা যশোদা সেজেছেল, আমি হনু বেষ্ট—তারপর গড়পাড় থেকে মোছলমানেরা এসে পড়ল—তারপর—"

সবাই থ হইয়া গেছে।

মূর্ত্তিটা হঠাৎ উঠিয়া পড়িল, ছেলেটার হাতটা ধরিয়া বলিল—"চ হারামজাদা—হ'ল যদি দু'টো চপকাটলিসের জোগাড় তো কোথা থেকে শনির মতন এসে জুটল—মালের মুখে যে একটু তোয়াক্ক করে লোকে খাবে—"

ছেলেটাকে টানিতে টানিতে ভিড় চিরিয়া ঈষৎ টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ একটা মিশ্র কলরব উঠিল—"চোর! চোর! পকেটমার! পাকড়াও! পালাতে দিও না!"

বাসের মধ্যেকার ব্যাপার। এরকম অসম্ভব ভিড় যে একটু ঘুরিয়া দেখাও দুষ্কর। তবু, একটা যে চাঞ্চল্য উঠিল তাহারই সুযোগে ঘাড়টি বাঁকাইয়া দেখি আমার হাত দুয়েক ওদিকে একটি ছোকরা অন্য একটি ছোকরার কামিজের বুকের কাছটা বেশ জোরে খামচাইয়া ধরিয়া বলিতেছে—"আলবাৎ নিয়েছিস, বের কর। পকেটে হাত দেবার সঙ্গে সঙ্গেই ধরেছি; এই হাত—"

চারিদিকের ভিড়টা আরও চাপ বাঁধিয়া উঠিয়াছে। মন্তব্য, উপদেশ, আদেশ আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে—জটিল এবং উগ্রও। যে ছোঁড়াকে ধরিয়াছে তাহার চেহারা মার্কামারা পকেটমারের—বেশভূষাও তদনুরূপ। যাহার জিনিষ গেছে তাহাকেও ভদ্র সন্তান বলিয়া মানিয়া লইতে বেগ পাইতে হয়, তবে উহারই মধ্যে একটু চাকচিক্য আছে।

পকেটমারটি বলিল—"এই হাত তো? দেখান আপনার ফাউনটেন পেন কোথায়, আপনি তো সঙ্গে সঙ্গে ধরেছেন বললেন।"

প্রথম ছোক্‌রা যেন তর্কে একটু ভ্যাবাচাকা খাইয়া গেল, ফ্যাল ফ্যাল করিয়া এদিক ওদিক চাহিতে সামনের একজন উঠিয়া পকেটমারটির গলাটা টিপিয়া একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল, "তুই আলবাৎ নিয়েছিস, সরিয়ে ফেলেছিস, তোদের দল থাকে—।" বেশ জোরে আর একটা ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"দে ফিরিয়ে, নৈলে দিলাম এই বসিয়ে—"

চারিদিক থেকে সমর্থন উঠিল—"হাঁ, দিন বসিয়ে, ঐ ওষুধ—পেটে কোঁৎকা দিলেই গলা দিয়ে বেরিয়ে পড়বে—"

একজন কথাটার সোজা মানে লইয়াই বলিল—"ব্যাটারা গিলেও ফেলে—"

বেড়ালে ইঁদুর ধরিয়া যেমন করে, ছোঁড়াটার তখন সেই অবস্থা চলিয়াছে—বরং আরও খারাপ, কেননা একটা ইঁদুরকে অনেকগুলি বেড়ালে ধরিয়াছে। তাহার মধ্যেই তর্ক চালাইবার চেষ্টা করিয়া বলিল —"গিলে ফেলবো! আস্ত একটা কোলম!"

প্রতিবাদে আরও চটিয়া গিয়া ভদ্রলোক দূর হইতে ঝুঁটি ধরিয়া আর সকলের চেয়ে একটু ঝাঁকানি দিয়া বলিল—"হাঁ কর দিকিন দেখি"—চুলের মুঠি ধরিয়াই গলাটা উল্টাইয়া ধরিল; স্বভাবতই মুখটা একটু হাঁ হইয়া যাইতে কয়েকজন ঝুঁকিয়া পড়িল—ছু'একজন একটু ডিঙি মারিয়াই।

আমি দেখিলাম—এ ঠিক হইতেছে না। সভায়—অর্থাৎ যেখানে আত্মরক্ষার উপায় নাই বা অল্প, সেখানে একটু হাতের সুখ উপভোগ করিয়া লইবার প্রবৃত্তিটা মজ্জাগত, চারিদিকে দেখিয়া মনে হইল গলা আর চুল বেহাত হওয়ায় কয়েকজন আর কোথায় বাগাইয়া ধরা যায় তাই লইয়া মনে মনে গবেষণাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছে। আমি উহারই মধ্যে ঠেলিয়া ঠুলিয়া একটু সামনে আগাইয়া গেলাম, বলিলাম—"আপনারা ভুল করছেন; গলার ভেতর থেকে যদি আস্ত একটি কলম বের করতে পারে তো মারের বদলে ওকে ভেল্কিবাজির জন্যে পয়সাই দেওয়া উচিত—"

কলরবটা একটু থামিয়া গেল। চোরের উপর সহানুভূতিসম্পন্ন দেখিয়া সবার মন্তব্যগুলা আমার দিকে ঝুঁকিবার মতো হইয়াছে, আমি বলিলাম—"ওকালতি করছি না, যা সব চেয়ে আগে করা দরকার তা আপনারা করতে ভুলে গেছেন; ওর জামা কাপড় ভালো করে দেখা দরকার আগে—"

"ঠিক বলেছেন, ঠিক বলেছেন উনি—বেটা বোধ হয় এতক্ষণ সরিয়েও ফেলেছে—"

চারিদিক থেকে প্রায় ছ' সাত জোড়া হাত খানাতল্লাসিতে লাগিয়া যাওয়ায় ভিড় এবং চঞ্চলতা আরও বাড়িয়া গেল, আমিও সেই আবর্ত্তের মধ্যে ভালো করিয়া পড়িয়া গেলাম। শীতকাল, জামার বাহুল্য আছেই সবার গায়ে, তাহার উপর র‍্যাপার, ছোঁড়াটাকে কেন্দ্র করিয়া যেন একটা জোট পাকাইয়া গেল। ছোঁড়াটা নিজের জামা চাপিয়া চাপিয়া ধরিতে লাগিল, বলিতে লাগিল—"বাঃ, জামার পকেটে হাত দেবার কে আপনারা মোসাই? আমি ভদ্রলোকের ছেলে আছি—এখানে কোতোরোকোম লোক আছে হাতসাফাই করে লিবে—বাঃ, মোসাই! আমি ভদ্রলোকের ছেলে—আমার নিজের পার্স আছে, বাঃ মোসাই!"

যাহারা চুল এবং গলা আয়ত্ত করিয়াছিল, ছাড়িয়া দিতে হইল বলিয়া আমার উপর বেশ বিরক্ত হইয়াছে, একজন কানডাকটারকে বলিল—"বানকে, বানকে!"—বাসটা থামিলে নামিয়া যাইতে যাইতে বলিল—"মারের চোটে কলম বেরুত, তা যা শুভানুধ্যায়ী সব জোটে!"

আমার দিকে একবার আড়ে চাহিয়া লইল, তাহার পর সিঁড়ির একটা ধাপে পা দিয়া বেশ ভালোভাবেই চাহিয়া বলিল—"নিজেই বা কি কে জানে, পোষাক ভদ্রলোকের হলেই যদি ভদ্রলোক হোত তা'হলে—" নামিয়া গেল।

এদিকে ব্যাপারটা আরও ঘোরালো হইয়া উঠিয়াছে। ছোঁড়াটার গায়ে একটা কোট, তাহার নিচে একটা পাঞ্জাবী, তাহার নিচে একটা ফতুয়া, অনেকগুলি পকেট; কিন্তু কলম পাওয়া যাইতেছে না। অত পকেটের বাড়াবাড়ি অথচ কলম পাওয়া যাইতেছে না—অর্থাৎ প্রমাণ রহিয়াছে অথচ মাল লোপাট—সকলে আবার ক্রমেই উগ্র হইয়া উঠিতেছে, খানাতল্লাসি ছাড়িয়া অন্যরকম ব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত হইতেছে।

দেখিতেছি জিনিষ লউক বা না লউক ছোঁড়াটার অদৃষ্টে মার আছেই আজ, ঠেকাইতে পারা যাইবে না। এদিকে ভিড়ের চাপে শীতেও ঘামিয়া উঠিতেছি ; আর এই ব্যাপারের মধ্যে থাকিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না। ভাবিতেছি নামিয়া না হয় অন্য গাড়িতেই চলিয়া যাই, এমন সময় হ্যারিসন রোডের চৌমাথায় বাসটা আসিতে গাড়িটা একটু খালি হইল, নিচে থেকে উল্টা স্রোত ঠেলিয়া আসিবার পূর্ব্বেই আমি গিয়া একটি সামনের সীট দখল করিলাম।

এমন সময় সেই কেন্দ্র হইতে হঠাৎ একটা তুমুল কলরব উঠিল---"পাওয়া গেছে! পাওয়া গেছে! যাবেই পাওয়া! ওর চেহারাতেই লেখা রয়েছে—পকেটমার।"—চড়, ঘুসি আবার সক্রিয় হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল।

আমি তখন খানিকটা দূরে, সেখান থেকেই দেখিলাম, একজন মুঠার মধ্যে একটা কলম চাপিয়া বিজয়োল্লাসে তুলিয়া ধরিয়াছে, কলমের মাথাটা মাত্র দেখা যাইতেছে। আমারই পরামর্শের এই সফলতা, কাছে যাহারা বসিয়াছিল আমি তাহাদের মুখের দিকে চাহিয়া একটু বড়াই করিয়া বলিলাম—"পাওয়া যেতে বাধ্য। ওরা সবাই মার দিতে ব্যস্ত! আমি বললাম—আরে পকেট দেখো আগে--ভালো করে খানাতল্লাসি করো, শুধু মারলেই কি হবে?"

কয়েকজন সমর্থন করিল, একজন বৃদ্ধ গোছের লোক বলিলেন—"ঐতো দোষ ; তবে আর বলি কেন?"

ওদিকে গোলমালটা হঠাৎ একটু ঠাণ্ডা পড়িয়া গেল। ফিরিয়া চাহিতেই শুনিলাম, যাহার কলম হারাইয়াছে সে বলিতেছে—না, আমার নয়, আমারটা ছিল অন্যরকম, এর চেয়ে খারাপ মোসাই, মিথ্যে কথা কেন বলতে গেলুম?"

ছোঁড়াটাও জো পাইয়া মেজাজ দেখাইতেছে—"ঐ লিন, যার

কোলোম সে বলছে আমার নয়—কি মোসাই ? চুল ছেড়ে দেন,—মার পড়ে রয়েছে অমনি!—আমার নিজের কোলোম—দুমাসও হয় নি কিনেছি—দেন, ফিরিয়ে দেন আমার কোলোম মোসাই—আমি ভোদ্দোরলোকের ছেলে, কারবার করি, কোলোম থাকবে না একটা ?”

“তোর কারবারে কতগুলো করে এরকম কলম আমদানী আর বিক্রি হয় রোজ ?”

“কি মোসোয়, আপনি ওরকম কথা বলবার কে ? মানহানির চার্জ্জে ফেলে দিতে পারি জানেন ? কোলোম পান আমার কাছে, দশ ঘা জুতো মেরে নাম্যো দিন, আমার কোলোম নেবেন কেন ? দেন ফিরিয়ে দেন—”

“কোথা থেকে কার পকেট মেরেছিস বল ; তোর কাছে ফাউনটেন পেন এলো কোথা থেকে—লাটসাহেবের কোন্ সেরেস্তায় তুই কাজ করিস ? ওকে থানায় নিয়ে যাও ঐ কলম সুদ্যু—হ্যাণ্ড ওভার করে দিন পুলিসকে—”

ছোঁড়াটা একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিল, বলিল—“তাই দেন, হ্যাণ্ড-ওভার করে, আমি যদি সাবুত দিতে না পারি জেলে দেবেখন—চলুন মোসাই, পুলিসকে বলবেন আপনার কোলোম আছে এটা—”

আমি চুপ করিয়া দেখিতেছিলাম আর ভাবিতেছিলাম ; ছোঁড়াটা দোরের দিকে ঘোরার সঙ্গে সঙ্গে আরও চার পাঁচ জন ঘুরিল। আমার মাথায় একটা বুদ্ধি আসিল, বলিলাম—“ও মশাই. আপনারা করছেন কি ? হ্যাণ্ড ওভারের নামে বেটার উৎসাহ দেখছেন না ? ওরা অমন রোজ দশবার করে হ্যাণ্ড ওভার হচ্ছে, দশবার করে পিছলে বেরিয়ে আসছে। পুলিস আর পুলিসকোর্টের তোয়াক্কা যদি রাখতো ওরা তাহলে আর ব্যবসা চালাতে পারত না—”

“তবে ?—তাহলে কি করা যায় ওকে নিয়ে ?—”

“এই খানেই কোর্ট বসাতে হবে—”

অনুমোদনের একটা উচ্ছ্বসিত কলরব উঠিল—“হাঁ, সেই ঠিক, উনি যা বলেছেন—এইখানেই একটা হেস্তনেস্ত করে ঘা কতক দিয়ে কান ধরে নামিয়ে দাও—”

“ঘা কতক দিলেই হোল ! চুরি করেছি প্রুপ করুন মোসাই—পিঠ আমার আঁতুড়ে-ষষ্ঠীর কুলো পেয়েছেন !—”

আমার মনটা কৌতুকরসে সিক্ত হইয়া আসিতেছে, বিচারকের ভূমিকা লইয়া আরও একটু ভালো করিয়া ঘুরিয়া বলিলাম—“মেরে কুলুতে পারবেন ? মার খেয়ে খেয়ে ওদের ঘাটা পড়ে গেছে। এক কাজ করুন, ও ছোকরার জিনিষ হোক না হোক ঐ কলমটাই ওকে দিয়ে দিন—নাও হে, তুমি ঐটেই নাও, কি কলম ছিল তোমার ?”

“ব্ল্যাকবোর্ড ছেল আমারটা মোসাই।”

“এটা কি ?”

যাহার হাতে কলমটা ছিল দেখিয়া বলিল—“পার্কার।”

বলিলাম—“বাঃ, ছোকরার কপাল ভালো, ব্ল্যাকবোর্ডের বদলে যদি পার্কার পাওয়া যায়—”

ছোঁড়াটা আরও হৈ চৈ লাগাইয়া দিল—“দেন মোসাই আমার কোলোম, বাঃ, এ মগের মুল্লুক আছে নাকি, মোসাই ! কোলোম দিয়ে দেন—”

তাহার ওজর আপত্তি, হাতচালা, মাথা চালার মধ্যেই লোকটি কলমটা ছেলেটিকে দিয়া দিল। সে নির্বিবাদে সেটা পকেটস্থ করিয়া পরের ষ্টপেজে নামিয়া গেলে এ ছোঁড়া একবার প্রাণপণে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া তাহার অনুগমন করিবার চেষ্টা করিল ; কয়েকজন তাহার চুল, গলা, কব্জি, বাহু শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিয়া রহিল—ছোঁড়াটা এদিকে আরও চীৎকার জুড়িয়া দিয়াছে—তাহার পর গোটা পাঁচেক ষ্টপেজ পার হইয়া গেলে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। আমার পাশের বৃদ্ধ ভদ্রলোক

বলিলেন—"হাঁ, এ মন্দ বিচার করেন নি ; আরে, কলম আসলে যার তার তো গেলই, তবে একটা আকাট পকেটমারের কাছে থাকে কেন ?—এ ছোকরাকে দিয়ে দেওয়া খুব বিচক্ষণতার কাজ হয়েছে—তার তো একটা গেছে—আর ঐ ছোঁড়ারই হাতে—না, তারিফ করতে হয় বৈকি ; সুবিচার হয়েছে—"

এক ধরণের লোক আছে অতি সামান্য কথাও খুব ফেনাইয়া তুলিতে ভালবাসে, বৃদ্ধ সেই ধরনের। বিচার লইয়া খুব আমার প্রশংসা করিল ; একটু আবার কৌতুকপ্রিয়ও আছে—বৃদ্ধেরা সাধারণত যেমন হইয়া থাকে, বলিল—"আর ঐ যে বলেছেন এখানেই কোর্ট বসাব, তা সত্যিই কোর্ট—আসামী, ফরিয়াদী, পুলিস, জুরি—সবই তো মজুদ—কোর্টের তো আর একটা নেজ হয় না,—বিচারও আপনার চমৎকার হয়েছে।—মশাইয়ের নাম ?"

নাম বলিতে—"নিবাস ?"

তাহাও বলিলাম। প্রশংসায় মানুষের মন যায়ই গলিয়া, বরং প্রশংসার কারণ যত অল্প মনটা তত বেশি গলে ; আমিও ভদ্রলোকের নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহার পর আরও প্রশংসা শুনিবার লোভেই হোক বা যে জন্যই হোক, একটু মিথ্যার অবতারণা করিয়া বলিলাম—"বাঃ, ঐখানে আপনার বাড়ি ? আমার তো প্রায়ই যাতায়াত ওধারে, আলাপ করা যাবে একদিন গিয়ে। দাঁড়ান, ঠিকানাটা লিখে নিই—"

পকেট বুকটা বাহির করিলাম, তাহার পর কলমের জন্য বুক-পকেটে হাত দিয়াই চক্ষুস্থির ! কলমটি অদৃশ্য হইয়াছে।

বৃদ্ধের প্রশংসা আবার উল্টা স্রোতে ছুটিল—"সরিয়ে নিলে ! সেকি মশাই ! কতক্ষণই বা আপনি ওখানে দাঁড়িয়েছিলেন !—পার্কার কলম ?—তাহলে তো দেখছি আপনি বিচার করে যেটি ও ছোকরার হাতে তুলে দিলেন সেইটেই মনে হচ্ছে ! এযে ভেল্কি দেখিয়ে দিলে মশাই—গলা

থেকে কলম বের করলে আর কী ভেল্কি হোত বলুন ?—আর কেমন ফর্সা করে বেরিয়েও গেছে সবাই দেখুন একজন একজন করে—না, তারিফ করতে হয় বৈকি—ও আসামী, ফরিয়াদী, পুলিস, জুরি, উকিল—সব বেটাই এক সাটের—একটা গোলমাল বাধিয়ে আপনাকে টেনে নিয়ে কেমন হাল্কা করে ছেড়ে দিল !—আবার আপনাকেই সাজালে কোর্টের হাকিম, একবার রসিকতাটুকু দেখুন !—করতে হয় না প্রশংসা—বলুন না—পারা যায় প্রশংসা না করে ?—"

চোরের চেয়ে বিচারককে দেখিবার জন্য সকলের দৃষ্টি বেশী কৌতূহলী হইয়া উঠিয়াছে ; ঐ প্রশংসা, তাহার উপর আবার লাখোরকম প্রশ্ন : কলম যাক, এখন পা উঠিতেছে না যে নামিয়া কোন রকমে পরিত্রাণ পাই।

॥ সমাপ্ত ॥